সাহিত্য-সঞ্চয়ন

প্রথম ভাগ

শ্রীভূদেব চৌধুরী

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal as a
Text-Book for Class VI of Secondary Schools
(*Vide* Notification No. Syl./82/54, dated 27. 12. 54)

সাহিত্য-সঞ্চয়ন

১ম ভাগ

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক,
শ্রীভূদেব চৌধুরী, এম্. এ.
প্রণীত

সংশোধিত অষ্টম সংস্করণ—১৯৬২

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীতড়িৎকুমার বসু
বাণী বিহার
৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য : ৯২ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর : দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা স্ট্রীট, কলি.-৬

সূচীপত্র

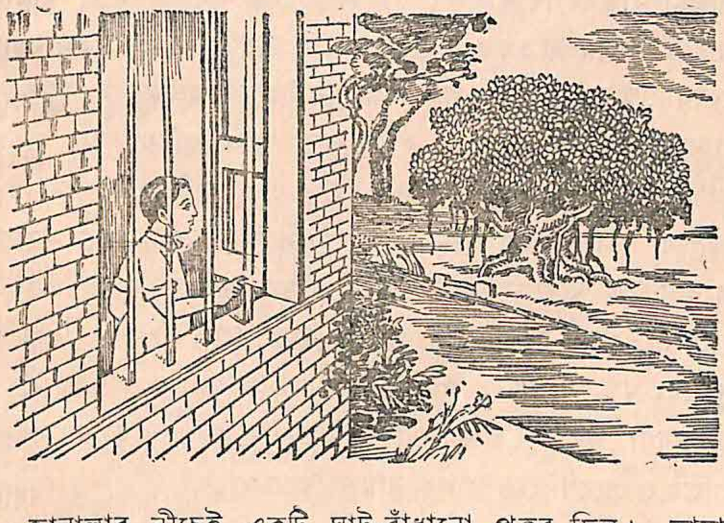
গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

———

বাল্য-স্মৃতি

আমাদের এক চাকর ছিল, তার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে একটি ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।



জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে

নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি, জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে, আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময় ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই—ধীরে সুস্থে স্নান করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিন বার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নান-স্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগ্‌লি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চু চালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে

অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম, এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম :—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত, তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুড়ি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন দুর্দিনের ছায়া-রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। ছোটবেলায় তুমি কখনো বন্দী ছিলে কি? তখন তোমার কি মনে হইয়াছিল? নিজের শিশু-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার একটি কাহিনী লিখ। রবীন্দ্রনাথের গল্পের সহিত তাহার কোন মিল আছে কি?

২। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া একটি পুকুরের বর্ণনা লিখ।

৩। তুমি নিজে কখনো কোন পুকুর দেখিয়াছ কি? একা একা পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া তোমার কি মনে হয়? নিজের অভিজ্ঞতা অথবা কল্পনা হইতে এ বিষয়ের একটি বর্ণনা লিখ। রবীন্দ্রনাথেরই বা নির্জন পুকুরের প্রতি তাকাইয়া কি মনে হইয়াছিল?

৪। অর্থ বুঝাইয়া বল :—

(ক) দৈবাৎ সেখানে যেন······গিয়াছে।

(খ) আর সেই বালক······গণনা করিতেছে।

———

সংখ্যা-পরিচয়

প্রথমবার কলিকাতা আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাট্‌না বাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোঁতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, "বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোঁতা আছে কেন ?" তিনি আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন।" আমি বলিলাম, "বাবা, মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" তখন তিনি বলিলেন, "এটি ইংরেজী



কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ, ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর ; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোঁতা আছে, উহাতে এক, দুই, তিন অঙ্ক খোদা রহিয়াছে, এই পাথরের অঙ্ক

উনিশ ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ।” এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় “একের পিঠে নয়,—উনিশ” ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, “তবে এইটি ইংরেজীর এক, আর এইটি ইংরেজীর নয়।” অনন্তর বলিলাম, “তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব।” তিনি বলিলেন, “আজ দুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল ষ্টোন যেখানে পোঁতা আছে, আমরা সে দিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব।” আমি বলিলাম, “সেটি দেখিবার আর দরকার নাই, এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই আমি ইংরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।”

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকট গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। ‘মনবেড়’-চটিতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, “বাবা, আমার ইংরেজী অঙ্ক চিনা হইল।” পিতৃদেব বলিলেন, “কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি।” এই বলিয়া তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন ; আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা, নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে,—ইহা জানিয়া চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহা পরীক্ষা করিবার

নিমিত্ত কৌশল করিয়া আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না, অনন্তর পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কোন্ মাইল ষ্টোন বল দেখি।" আমি দেখিয়া বলিলাম, "বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুঁদিতে ভুল হইয়াছে, এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুঁদিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন, তিনি আমাকে চিবুকে ধরিয়া, "বেশ বাবা, বেশ,"—এই বলিয়া অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।"

যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অনুশীলনী

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম কখনো শুনিয়াছ? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান নিজের ভাষায় লিখ।

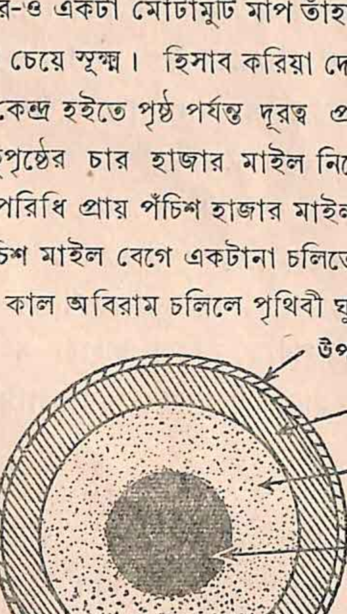
২। তুমি ইংরেজী এবং বাংলা সংখ্যা গুণিতে শিখিয়াছিলে কি করিয়া? বিদ্যাসাগরই বা কি করিয়া ইংরেজী সংখ্যা গুণিতে শিখিয়াছিলেন?

৩। তোমার গোণা শেখা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গোণা শেখায় কোন প্রভেদ আছে কি? ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের কোন্ বিশিষ্টতার পরিচয় দেখিতে পাও।

৪। অর্থ বুঝাইয়া বল :—মাইল ষ্টোন, সমভিব্যাহারী, সম্বোধিয়া।

পৃথিবী

পৃথিবী যে গোলাকার, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীদের এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না ; এমন কি, পৃথিবী কত বড়, তাহার-ও একটা মোটামুটি মাপ তাঁহাদের জানা ছিল। এ কালের মাপ তার চেয়ে সূক্ষ্ম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গোলাকার পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় চার হাজার মাইল। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের চার হাজার মাইল নিম্নে পৃথিবীর কেন্দ্র বর্তমান। পৃথিবীর পরিধি প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল। অর্থাৎ রেলওয়ে গাড়ী ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে একটানা চলিতে পারিলে প্রায় বিয়াল্লিশ অহোরাত্র কাল অবিরাম চলিলে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারিবে।



এত বড় পৃথিবীটা মোটের উপর কোন্ জিনিষে গঠিত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তর যে কঠিন অবস্থায় আছে, তাহা অনেকে অনুমান করেন। আমরা মাটি খুঁড়িয়া ভূগর্ভে অতি অল্প দূরে নামিতে পারি। উহাতে পৃথিবীর পিঠের চামড়াটার

যৎকিঞ্চিৎ খবর পাওয়া যায় মাত্র। মাটি খুঁড়িয়া, গর্ত করিয়া, বা খনির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই চামড়াটারও কয়েক ফুটের অধিক দেখা যায় না। তবে পৃথিবীর পিঠের চামড়া জায়গায় জায়গায় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও গভীর গর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর পিঠ যেখানে উঠিয়া আছে, তাহাকে বলি মহাদেশ ; আর যেখানে নামিয়া গিয়া গর্ত হইয়াছে তাহাকে বলি মহাসাগর ; ঐ গর্ত লোণা জলে পরিপূর্ণ। মহাদেশের পিঠে পাহাড়-পর্বতগুলি কয়েক মাইল পর্যন্ত স্থানে স্থানে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের হিমালয়ের এক একটা শৃঙ্গ নিম্নস্থিত ভূপৃষ্ঠে ভারতবর্ষের জমি ছাড়িয়া পাঁচ মাইলের উপরে উঠিয়াছে। চামড়াটা ঐরূপ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে আবার ফাটিয়া গিয়া বা ক্ষয় হইয়া উহার অভ্যন্তর প্রকাশ করিতেছে, কাজেই সেই চামড়ার অবস্থা কতক বুঝা যায়।

এই চামড়াটা বস্তুত-ই পাষাণ-নির্মিত। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাহাই থাকুক, পৃথিবীর পিঠ যে চামড়ায় ঢাকা আছে, তাহা পাষাণের চামড়া। সেই পাষাণই স্থানে স্থানে পাহাড়-পর্বত নামে অভিহিত। নানাবিধ ধাতু, বিশেষতঃ আলুমীনম্ ধাতু, কি জানি কোন্ কালে অক্সিজেনে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়াছিল, এবং পরে সেই আলুমীনম্ ভস্ম বালুকার সহিত মিলিত হইয়া এই পাষাণের উৎপত্তি করিয়াছে। যুগ ব্যাপিয়া, কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া, জলে-বাতাসে-নীহারে সেই পাষাণ ভগ্ন, চূর্ণ, শিথিল হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে ; এবং সেই মৃত্তিকা উচ্চভূমি হইতে জলস্রোতে নিম্নভূমিতে আনীত হইয়া সমতল দেশের গঠন করিয়া উহাকে শস্যশালী ও জীব-জন্তুর আবাস-যোগ্য করিয়াছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ কোমল মৃত্তিকায় নির্মিত, এরূপ মনে করা ভুল ; ইহা কঠিন পাষাণে নির্মিত। বসুন্ধরার পিঠ পাষাণের পিঠ ; ঐ পাষাণের

পিঠের উপর স্থানে স্থানে মৃত্তিকার একটু প্রলেপ আছে মাত্র। যেখানে মৃত্তিকা দেখিবে, তাহার নীচে পাষাণ আছে বুঝিতে হইবে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মাটির অল্প নীচে পাষাণ পাওয়া যায়, এমন কি, বহু স্থলে মাটি ছাড়িয়া পাষাণ বাহির হইয়া রহিয়াছে, উহাই পাহাড়। ঐ পাষাণও ক্রমে মাটিতে পরিণত হইতেছে ; কিন্তু সেই মাটি অত উঁচুতে দাঁড়াইতে পারে না, জলস্রোতে, নদীস্রোতে নিম্নতর ক্ষেত্রে নামিয়া আসে। বাঙ্গালা দেশের মাটির নীচেও পাষাণ আছে, তাহা এত নীচে পড়িয়া আছে যে, এ পর্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া পাষাণটা কেহ বাহির করিতে পারেন নাই।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অনুশীলনী

১। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার সম্বন্ধে কোন দিন কিছু ভাবিয়াছ কি ? আমাদের এই পৃথিবীটা কত বড় কল্পনা করিতে পার ?

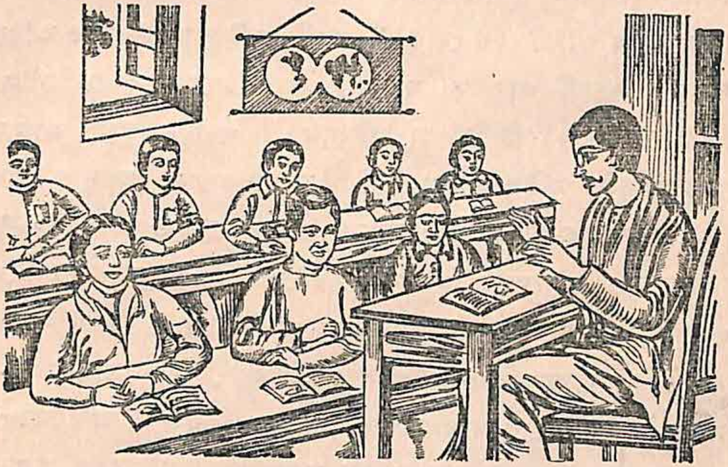
২। উপরের প্রবন্ধে লেখক পৃথিবীকে কয়টা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ও তাহা কি কি ? কোন একটি মহাদেশের নাম করিতে পার ? সাগর কখনো দেখিয়াছ ?—সাগর সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে ?—আর মহাসাগর ?—একটি মহাসাগরের নাম কর।

৩। পাহাড় কি করিয়া উঁচু হইয়া উঠে, বলিতে পার ?

৪। লেখক বলেন, পৃথিবীর চামড়া পাষাণ দিয়া তৈরী ; অথচ আমরা পৃথিবীকে দেখি কোমল মাটি দিয়া গড়া। কেন এমনটি হয়, বুঝাইয়া বলিবে ?

দুই বন্ধু

মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্‌কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছে।



রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভর্তি হইলাম, সেইদিন রামচন্দ্রবাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদের বুঝাইয়া দেন। ইংরেজী-ওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন

এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল, কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানা পুথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ গোলাধ্যায় পুথির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা ত পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন; এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটিও আমাকে পুথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা তোমার বাবা বলবেন বৈ কি; তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবিষয়ে অনভিজ্ঞ।" রামচন্দ্রবাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কালো হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল; দেখিলে অতি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটির পর একেবারে আমার নিকট আসিয়া শেকহ্যাণ্ড করিয়া আমাকে

জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার নাম কি, কোথায় বাড়ী তোমার" ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া, একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিলাম।



ইনিই মধু। এইদিন হইতে ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যে উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন। আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন; গায়ে মাথায় ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোনদিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই; মধু আমায় তজ্জন্য কোনদিন অনুরোধ করে নাই। বোধ হয় আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এইজন্য সম্ভবতঃ, মধু আমাকে

ওরূপ অনুরোধ কোনদিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি এক সঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সেখানি আমায় না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফল কথা, উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা উভয়ে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ষোল মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক পাঁচ টাকার



হিসাবে বেতন ধরিয়া ষোল মাসে আশী টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন ; সুতরাং এত টাকা পরিশোধ করার পর আবার মাসিক পাঁচ টাকা দিয়া আমাকে হিন্দু কলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না ; অগত্যা আমার হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ করিবে ?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ ; পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য পড়া বন্ধ হইবে ? আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।" ঐ বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত

হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায়, আমাকে মধুর অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে; আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। উপরের গল্পে যে দুইটি বন্ধুর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা কে কে? ইঁহাদের সম্বন্ধে পূর্বে কখনো কিছু শুনিয়াছ কি?

২। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদনের প্রথম বন্ধুত্বের গল্পটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। এই গল্প পড়িয়া কোন্ বন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হয়?

৩। উপরের গোটা গল্পটি পড়িয়া ভূদেব ও মধুসূদনের চরিত্রের যে পরিচয় পাইয়াছ তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখ। ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে কাহাকে তোমার বেশী ভাল লাগে এবং কেন?

৪। রামচন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন—ভূদেবের পিতা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না।—কেন, বলিতে পার কি?—উপরের গল্প হইতে ভূদেবের পিতা ও মাতার কি পরিচয় পাও?

দয়া

পরের দুঃখ মোচনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত জগদীশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন। দয়া অতি প্রধান ধর্ম। যিনি কাহারও উপকার করেন, তিনি মনে মনে অতি পবিত্র অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন। যিনি উপকৃত হন, তিনি আসন্ন বিপদ বা উপস্থিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করিলেই যে দয়া প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমন নহে। দয়ালু ব্যক্তি সহস্র প্রকারে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অপর সাধারণের দুঃখ দূর করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যতদূর সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহার উপায় করা উচিত। জ্ঞানোপদেশ, ধর্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ দান ইত্যাদি শুভকর্ম দ্বারা সকলকে সুখী করিবার চেষ্টা করা উচিত। কর্কশ বাক্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে না হয়, এ নিমিত্ত ক্রোধ সংবরণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস করা উচিত। লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসরণ না করিয়া দয়া ও বাৎসল্যভাব প্রকাশ করা উচিত। পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া সাধ্যানুসারে তাহার ক্লেশ নিবারণ করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। জ্ঞান ও ধর্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত একান্তমনে চেষ্টা করা, এবং সর্বসাধারণের হিতকর কার্যে সতত নিযুক্ত থাকা উচিত।

যিনি এইরূপ আচরণ করিয়া কালহরণ করিতে পারেন, তিনি ধন্য ; তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হন ; তিনি অনাথদিগের আশীর্বাদ ও

পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করেন; তাঁহার মানবজন্ম গ্রহণ করা সার্থক।

—অক্ষয়কুমার দত্ত

অনুশীলনী

১। দয়া বলিতে কি বুঝ? কেবল গরীব-দুঃখীকে দান করিলেই দয়া দেখানো হয়, অন্যপ্রকারে হয় না,—ইহা কি সত্য?

২। কি কি প্রকারে দয়া প্রকাশ করা সম্ভব,—বিশদভাবে বল।

৩। তুমি কখনো এরূপ দয়ার কর্ম করিয়াছ কি? অথবা করিতে ইচ্ছা কর কি?

৪। প্রত্যেকটি শব্দ দিয়া একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :—

অনির্বচনীয়, শিষ্টাচার, কর্কশ, রসনা, নিঃসরণ, নিকেতন।

দেশের ধন

মেবারের প্রান্তভাগে একটি বন—তন্মধ্যে ভগবতীর একটি ভগ্ন মন্দির।
দূরে চিতোরের জয়স্তম্ভ দৃশ্যমান।
দুইটি বালক লইয়া প্রতাপ সিংহ ও রাজমহিষীর প্রবেশ।

প্রতাপ। (স্বগত) জন্মভূমি চিতোর—তোমাকে জন্মের মত বিদায় দি—তোমার এ অযোগ্য সন্তানের নিকট আর কোন আশা করো না—আর একটু পরেই তোমার ঐ উন্নত জয়স্তম্ভ আমার চক্ষের অন্তরাল হবে—এইবার ভাল করে দেখে নিই—আমি তোমার কুসন্তান—আমা হতে তোমার কোন উপকার হল না। (অবলোকন করিয়া) হায়! এ সব স্থান পূর্বে লোকালয় ছিল—গীত-বাদ্য-উৎসব-কোলাহলে পূর্ণ ছিল, কত হাস্যময় শস্যক্ষেত্র এখানে প্রসারিত ছিল, এখন এখানে কি ভীষণ অরণ্য—মধ্যাহ্নে যেন দ্বিপ্রহর অমাবস্যা রাত্রি—কি গভীর নিস্তব্ধ—আমার নিষ্ঠুর হস্তই এই হাস্যময় প্রদেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে।—

মহিষী। মহারাজ!—আর কতদূর যেতে হবে?—আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি, আর পারিনে—

প্রতাপ। এই মন্দিরের সোপানে বসে একটু বিশ্রাম কর।

মহিষী। আয় বাছারা, আমরা এইখানে বসি—

প্রতাপ। হা! দুর্জয় কাল এই মন্দিরটির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য কত অত্যাচারই না করছে—ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ওর মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে—অশ্বত্থের মূল-জাল অন্তর

বাহির ভেদ করে কি নিষ্ঠুর রূপেই ওকে বেষ্টন করেছে—তবু কেমন নিজ ভিত্তির উপর উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান !—আমার প্রতি অদৃষ্টের যতই অত্যাচার হোক্ না—আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় দুঃখের মূল বিস্তৃত হোক্ না কেন—তবু আমার উন্নত মস্তক কখনই নত হবে না।



মহিষী। মহারাজ! আমরা এ দুর্দশা আর কত দিন ভোগ করব?—আকবর সন্ধি করার জন্যে যে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তার কি হল?—

প্রতাপ। সন্ধি? মহিষী, ওকথা মুখেও এনো না,—সন্ধি?—তার অর্থ বন্দী হওয়া,—হে মা ভগবতি, সে দুর্দশা যেন আমাদের না হয়। এসো আমরা সকলে মিলে ভগবতীর চরণে প্রার্থনা করি,—তিনি দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী—অবশ্যই আমাদের দুর্গতি মোচন করবেন।

[সকলের সমস্বরে ভগবতীর স্তুতি গান]

কতকগুলি রাজপুত সৈন্য লইয়া মন্ত্রী ভাম-শা'র বনমধ্যে প্রবেশ

ভাম-শা। দেখ রাজপুতগণ, ঐ দিক থেকে সঙ্গীতের ধ্বনি আস্‌ছিল না?—এইমাত্র যেন থামল! নিশ্চয় ঐখানে আমাদের মহারাজ আছেন—তোমরা কি শুন্‌তে পাও নি?

সৈন্যগণ। হাঁ মন্ত্রিবর, আমরা শুন্‌তে পেয়েছি—চলুন, ঐ দিকে চলুন—শীঘ্রই চলুন—মহারাজ প্রতাপ সিংহের জয়! মেবারের জয়!

প্রতাপ। (প্রণাম করিয়া উঠিয়া) কি! এই ভীষণ অরণ্যে রাজপুত-দিগের জয়ধ্বনি!—আমার সৈন্যসামন্ত তো আর কেহ নেই—আমি এখন অসহায় নিরাশ্রয় পথের পথিক—আমি তো আর সে মেবারের রাণা নই—কোথা হতে তবে এ জয়ধ্বনি হচ্ছে?

সৈন্যগণ। জয়, প্রতাপ সিংহের জয়!

প্রতাপ। (পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক সবিস্ময়ে) এ কি! এ কি! সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মন্ত্রিবর!

সৈন্যগণ। মহারাণার জয়!—

প্রতাপ! মন্ত্রিবর! তুমি এই সৈন্যসামন্ত লয়ে কোথা থেকে এলে? (আলিঙ্গন)

ভাম-শা। আমরা কোন বিশ্বাসী লোকের প্রমুখাৎ অবগত হলেম যে, মহারাজ নিরাশ হয়ে সপরিবারে মেবার পরিত্যাগ করে মরুভূমি অঞ্চলে যাত্রা করেছেন—সেইজন্য আমরা মহারাজের সন্ধানে নির্গত হয়েছি—আমাদের প্রাণ থাক্‌তে আপনাকে দেশ-ত্যাগী হতে কখনোই দেখ্‌তে পারব না—আমরা কয়জন মহারাজের চির-অনুগত সেবক ও দাস আছি—এই অসময়ে যদি আমরা মহারাজের কোন উপকারে আসি, তা হলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়।



প্রতাপ। মন্ত্রিবর, বংশ-পরম্পরাক্রমে তোমরা যে আমাদের হিতৈষী বন্ধু, তা আমি বিলক্ষণ জানি—তোমার কিছুমাত্র ত্রুটি নেই। কিন্তু এই কয়টি সৈন্য নিয়ে তুমি কি মেবার উদ্ধার করবে?—তুমি ত জান মন্ত্রিবর—আমি এখন নিঃসম্বল পথের ভিখারী—

আমার ধনাগার শূন্য ; সৈন্য সংগ্রহ করবার আমার কিছুমাত্র কি সম্বল আছে ?

ভাম-শা। মহারাজ! সম্বলের অভাব কি ?—এই নিন, আমার যথাসর্বস্ব আপনার চরণে সমর্পণ করলেম। এতে বার বৎসর কাল পঁচিশ হাজার সৈন্যের ভরণ পোষণ চল্‌তে পারবে।

প্রতাপ। কি মন্ত্রিবর, তোমার কষ্টার্জিত ধন অনায়াসে আমার হাতে সমর্পণ করলে ?

ভাম-শা। মহারাজ! এতে কি কষ্ট! আপনার ধন আপনাকেই দিলেম—দেশের ধন দেশকেই দিলেম।

প্রতাপ। আ! মন্ত্রিবর, আমার এ কৃতজ্ঞতা কোথায় রাখ্‌ব—কণ্ঠ রোধ হচ্ছে, কি বলে আমার এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ?—এই শুষ্ক নেত্রের অশ্রু উপহার লও—আর কি দেব ? এস মন্ত্রিবর! হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি!

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। ভাম-শা কে ছিলেন ? ভাম-শা ও প্রতাপের গল্পটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ভাম-শা কেন তাঁহার কষ্টের অর্জিত ধন অনায়াসে প্রতাপের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন ; কেনই বা নিজের ধনকে 'দেশের ধন' বলিয়াছিলেন ? তোমার নিজের ধনকে 'দেশের ধন' বলিয়া ভাবিতে পার কি ?

৩। প্রত্যেকটি শব্দ দিয়া একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :—
প্রসারিত, অবসন্ন, প্রমুখাৎ, বংশ-পরাম্পরাক্রমে।

৪। ব্যাখ্যা কর :—(ক) আমার প্রতি অদৃষ্টের··· কখনই নত হবে না।
(খ) আপনার ধন আপনাকেই···দেশকেই দিলেম।

———

দেবীরাণীর দরবার

প্রাতঃসূর্য প্রভাসিত, নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবীরাণীর 'দরবার' বা 'এজলাস'। সে এজলাসে কোন মোকৰ্দমা-মামলা হইত না। রাজকার্যের কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল; কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই, তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহার মাঝখানে দেবীরাণীর এজলাস। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙানো হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাবের চাঁদোয়া টাঙানো,—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দন কাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা, তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষায় আজ বিশেষ জাঁক। সাড়ী পরা! সাড়ীখানার ফুলের মাঝে মাঝে এক এক-খানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত,—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় মতির হার। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালের প্রকৃত দেবী প্রতিমার মত সাজিয়াছেন।

দুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণ-দণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহু সংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার বড় জাঁকের পোষাক করিয়া বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক বরকন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচ

শত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলের সুসজ্জিত লাল পাগ্ড়ি, লাল আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মাল-কোচা মারা, পায়ে লাল নাগ্রা, হাতে ঢাল সড়্কি। চারিদিকে লাল নিশান পোঁতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইলেন। সেই দশ হাজার লোকে একেবারে 'দেবীরাণীকি জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপর দশজন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতিগান



করিল। তারপর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক এক-জন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসন সমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকা পোরা ঘড়া সব সাজানো ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবী দরিদ্রদিগকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। একালের রাজা অথবা রাণীর দরবার সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কি? কল্পনা হইতে একটি রাজদরবারের বর্ণনা দাও। দেবীরাণীর দরবারের সঙ্গে তাহার কোনও মিল আছে কি?

২। রাজা-রাণীর দরবার কি জঙ্গলে বসে? দেবীরাণীর দরবার জঙ্গলে বসিত কেন?

৩। দেবীরাণীর দরবারের একটি বর্ণনা দাও; দেবীরাণী সেখানে কি করিতেন? দেবীরাণী এবং তাঁহার দরবারের দৃশ্যটি তোমার কেমন লাগে?

৪। অর্থ বুঝাইয়া বল :—এজলাস, মসনদ, চোপদার, আশাবরদার, বরকন্দাজ, আঙ্গরাখা।

৫। ব্যাখ্যা কর :—দেবী আজ শৎকালের……মত সাজিয়াছেন।

———

গাছের কথা

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোন গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে একপার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বল ত—এই গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডাল ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, এতে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়, জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখীর ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটির উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষ-শিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাক্‌না; তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানা প্রকার,—কোনটি অতি ছোট, কোনটি বড়। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড় হইবে, বলা যায় না। অতি

প্রকাণ্ড বটগাছ সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত-বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে ? তোমরা হয়ত কৃষকদিগকে ধান্যের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের



বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখীরা ফল খাইয়া দূরদেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জন-মানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূরদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল-ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায়, তখন তাহার মধ্য

হইতে বীজ তূলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম ; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তূলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দেশদেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কিনা, কেহ বলিতে পারে না। হয়ত কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাক্না গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে ; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড় ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা এবং ছোট ছোট ডাল ছিঁড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে ? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিন-রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধূলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষে চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার

দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে করিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশু ঘুমাইয়া রহিল।

—জগদীশচন্দ্র বসু

অনুশীলনী

১। গাছের উপরের ডালগুলি সবুজ পাতায় ঢাকিয়া থাকে, গাছের তলার ভাঙা ডালটি শুক্‌নো, পাতা-ঝরা, উই-ধরা :—এমনটি কেন হয় বলিতে পার?

২। জীবিত বস্তুর লক্ষণ কি কি? গাছের জীবনে সেই সব লক্ষণের উদাহরণ দিতে পার?

৩। ছোট বীজটি মাটিতে পড়িয়া ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড গাছ হইয়া উঠে,—কিরূপে?

৪। মানুষের সাহায্য ছাড়াও বীজ হইতে গাছ জন্মায়, এরূপ উদাহরণ দিতে পার? কি কি উপায়ে তাহা সম্ভব তাহা বুঝাইয়া বল।

৫। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে……বাহিরে যাই নাই।

(খ) পৃথিবী মাতার ন্যায়………করিয়া লইলেন।

শতবর্ষ আগে

[ব্রহ্ম ভ্রমণ]

মুলমীনে আসিয়া জাহাজ নোঙর করিল। এখানে মান্দ্রাজবাসী একজন মুদেলিয়ার আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি একজন গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্মচারী, অতি ভদ্রলোক। যে কয়দিন আমি মুলমীনে ছিলাম, সেই কয়দিনের জন্য আমি তাঁহারই আতিথ্য স্বীকার করিলাম। আমি অতি সন্তোষে এ কয়দিন তাঁহার বাড়ীতে কাটাইলাম। মুলমীন নগরের পথসকল পরিষ্কার ও প্রশস্ত। দু-ধারী দোকানে কেবল স্ত্রীলোকেরাই নানাপ্রকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে। আমি পেটরা ও উৎকৃষ্ট রেশমের বস্ত্রাদি তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিলাম ; বাজার দেখিতে দেখিতে একটা মাছের বাজারে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, বড় বড় টেবিলের উপরে বড় বড় মাছ সব বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সব অতি বড় বড় কি মাছ! তাহারা বলিল, "কুমীর"। বর্মারা কুমীর খায়।

মুদেলিয়ার আমাকে বলিলেন যে, এখানে একটি দর্শনীয় পর্বতগুহা আছে, অভিপ্রায় হইলে আপনাকে সঙ্গে লইয়া তাহা দেখাইতে পারি। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। তিনি এই অমাবস্যার রাত্রির জোয়ারে একটা লম্বা ডিঙি আনিলেন, তাহার মাঝখানে একটি কাঠের কামরা। সেই রাত্রিতে মুদেলিয়ার এবং আমি জাহাজের কাপ্তান প্রভৃতি ৭।৮ জনকে লইয়া তাহাতে বসিলাম এবং রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নৌকা ছাড়িলাম। আমরা সারারাত্রি সেই নৌকাতে বসিয়া জাগিয়া রহিলাম। সাহেবেরা তাঁহাদের ইংরাজী গান গাহিতে লাগিলেন,

আমাকেও বাংলা গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম সঙ্গীত গাহিতে লাগিলাম। সেই রাত্রিতে বার ক্রোশ চলিয়া আমরা আমাদের গম্যস্থানে ভোর চারটার সময় পঁহুছিলাম। আমাদের নৌকা তীরে লাগিল। এখনো সব অন্ধকার। তীরের অদূরে দেখি যে, একটা তরু ও লতাবেষ্টিত বাড়ী হইতে কতকগুলো দীপের আলো বাহির হইতেছে। আমি কৌতূহল-বিশিষ্ট হইয়া সেই অজ্ঞাত স্থানে সেই অন্ধকারে অন্ধকারে একা দেখিতে গেলাম।



গিয়া দেখি, একটি ক্ষুদ্র কুটির, তাহার মধ্যে গেরুয়া বসন পরা মুণ্ডিত-মস্তক কতকগুলি সন্ন্যাসী মোমবাতির আলো লইয়া তাহা একবার এখানে, একবার ওখানে রাখিতেছে। এখানেও কাশীর দণ্ডীর মত লোকদের দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। এখানে দণ্ডীরা আইল কোথা হইতে? তাহার পর জানিলাম যে, ইহারা ফুঙা, বৌদ্ধদিগের গুরু ও পুরোহিত। আমি আড়ালে থাকিয়া ইহাদের বাতির খেলা

দেখিতেছি, হঠাৎ তাহাদের একজন আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের ঘরের ভিতর আমাকে লইয়া গেল। বসিতে আসন দিল এবং পা ধুইবার জল দিল। আমি তাহাদের ঘরে গিয়াছি, তাহারা এইরূপে আমার অতিথি সৎকার করিল। বৌদ্ধদিগের অতিথি সেবা পরম ধর্ম।

প্রাতঃকাল হইল, আমি নৌকাতে ফিরিয়া আসিলাম। সূর্য-উদয় হইল। মুদেলিয়ারের আর আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসিয়া সেখানে যোগ দিলেন। ইহাতে আমরা পঞ্চাশ জন হইলাম। মুদেলিয়ার সেখানে আমাদের সকলকে আহার করাইলেন। তিনি অনেকগুলি হস্তী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমরা দুই চারিজন করিয়া সেই হস্তীতে চড়িয়া সেখানকার মহাজঙ্গল দিয়া চলিলাম। এখানে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়, আর ঘন জঙ্গল। হাতী ভিন্ন এখানে চলিবার আর অন্য উপায় নাই। আমরা বেলা তিনটার সময়ে সেই পর্বতের গুহার সম্মুখে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমরা হাতী হইতে নামিয়া এখান হইতে এক কোমর জঙ্গল ভাঙিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। সেই পর্বতগুহার মুখ ছোট, আমরা সকলে গুঁড়ি মারিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুই পা গুঁড়ি দিয়া গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম। তাহার ভিতরে ভারী পিছল। পা পিছ্‌লে যাইতে লাগিল। সেখান হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া খানিক দূর গেলাম। ঘোর অন্ধকার, দিন তিনটার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন রাত তিনটা! ভয় হইতে লাগিল যে, যদি সুড়ঙ্গের পথ হারাইয়া ফেলি, তবে আমরা বাহির হইব কি প্রকারে? সমস্ত দিন এই গুহার মধ্যে ঘুরিতে হইবে। এই ভাবিয়া আমি যেখানেই যাই, সেই সুড়ঙ্গের ক্ষুদ্র আলোটুকুর দিকে লক্ষ্য রাখিলাম। সেই অন্ধকার

গুহার মধ্যে আমরা পঞ্চাশ জন ছড়াইয়া পড়িলাম এবং দূরে দূরে দাঁড়াইলাম। আমাদের প্রতিজনের হাতে গন্ধকচূর্ণ। যেখানে যিনি দাঁড়াইলেন তিনি সেখানকার পর্বতে খুব্‌রীর মধ্যে সেই গন্ধকচূর্ণ রাখিয়া দিলেন। আমাদের দাঁড়ানো ঠিক হইলে কাপ্তান আপনার গন্ধকের গুঁড়া জ্বালাইয়া দিলেন। অমনি আমরা সকলে দিয়াসলাই দিয়া আপন আপন গন্ধকচূর্ণ জ্বালাইয়া দিলাম। একেবারে সেই গুহার পঞ্চাশ স্থানে পঞ্চাশটি রংমশালের আলো জ্বলিয়া উঠিল, আমরা গুহার ভিতরটা সব দেখিতে পাইলাম। কি প্রকাণ্ড গুহা! উপরের দিকে তাকাইলাম, আমাদের দৃষ্টি তাহার উচ্চতার সীমা পাইল না। গুহার ভিতরে বৃষ্টির ধারার বেগে স্বাভাবিক বিচিত্র কারু-কর্ম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইলাম। পরে আমরা বাহিরে আসিয়া সেই পর্বতে বনভোজন করিলাম এবং মুলমীনে ফিরিয়া আসিলাম।

ফিরিয়া আসিতে আসিতে পথে নানা যন্ত্র মিশ্রিত একতানের একটা বাদ্য শুনিতে পাইলাম। আমরা সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া নিকটে গেলাম। দেখিলাম যে, কতকগুলো বর্মা সেখানে অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছে। সেই আমোদে কাপ্তান সাহেবেরাও যোগ দিয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বড় আমোদ পাইলেন। একটি বর্মার স্ত্রী ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, সে সাহেবদের এই বিদ্রূপ দেখিয়া আমোদোন্মত্ত পুরুষের কানে কানে কি বলিয়া গেল, অমনি তাহারা নৃত্য ও বাদ্য ভঙ্গ করিয়া কে কোথায় পলাইল। কাপ্তান সাহেবেরা তাহাদের কত অনুনয় বিনয় করিয়া আবার নৃত্য করিতে বলিলেন, তাহারা শুনিল না, কে কোথায় চলিয়া গেল।

মুলমীনে ফিরিয়া আসিলাম। একটি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত বর্মার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম, তিনি বিনয়ের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। ফরাসের উপরে তিনি এক চৌকিতে আর আমি এক চৌকিতে বসিলাম। সে একটা প্রশস্ত ঘর! তাহার চারি কোণে তাঁহার চারিটি যুবতী কন্যা বসিয়া কি শিলাই করিতেছিল। আমি বসিলে তিনি বলিলেন, "আদা!" অমনি তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ে আসিয়া আমার হাতে একটি গোলাকৃতি পানের ডিবা দিল। আমি খুলে দেখি যে, তাহাতে পানের মশলা। বৌদ্ধ গৃহীদিগের এই অতিথি সৎকার। তিনি তাঁহাদের দেশের উৎকৃষ্ট অশোক জাতীয় কতকগুলি ফুলের চারা আমাকে উপহার দিলেন। আমি তাহা বাড়ী আনিয়া বাগানে রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এদেশে অনেক যত্নেও তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না।

—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। তুমি কথনো দেশ ভ্রমণে গিয়াছ? নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেশ ভ্রমণের একটি বর্ণনা দাও।

২। বাংলাদেশের বাইরে কখনো বেড়াইতে গিয়াছ? আমাদের প্রতিবেশী দেশের মানুষ অথবা প্রকৃতির সম্বন্ধে জানিতে তোমার ইচ্ছা হয় না কি? এখানে লেখক কোন্ দেশের বর্ণনা দিয়াছেন বলিতে পার? ঐ দেশ ও দেশবাসী আমাদের প্রতিবেশী কি?

৩। লেখক মুলমীন ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

৪। 'বৌদ্ধদিগের অতিথি সেবা পরম ধর্ম'—এ কথার সমর্থনে কোন গল্প বলিতে পার?

৫। উপরের প্রবন্ধে মুলমীনবাসীদের আচার-আচরণ এবং নৃত্য-গীতাদির যে বর্ণনা পাও তাহা বুঝাইয়া বল। তাহাদের সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছে?

মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার

হেয়ার ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০০ সালে ঘড়িওয়ালার কাজ লইয়া এদেশে আগমন করেন। এখানে বাসকালে এই কর্মসূত্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়। হেয়ার নিজে উচ্চদরের শিক্ষিত লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে, এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে এদেশের লোকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে না। তাঁহার দোকানে কেহ ঘড়ি কিনিতে বা মেরামত করিতে গেলেই তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। ১৮১৪ সালে রামমোহন রায় যখন কলিকাতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন অল্পকালের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল। ১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। সভা ভঙ্গের পর দুই বন্ধুতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, এদেশীয় বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হইবে। আত্মীয়-সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড্ ইষ্ট্ মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয় বা বর্তমান হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, হেয়ার তাহার কমিটির একজন সভ্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি ডাক্তার এইচ্-এইচ্ উইল্‌সনের পরামর্শের অধীন থাকিয়া অবিশ্রান্ত মনোযোগের সহিত স্কুলটির উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারী দিবসে হিন্দু কলেজ খোলা হয়। সেই বৎসরেই হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে স্কুল বুক সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। ঐ সভার সভ্যগণ ছাত্রগণের পাঠোপযোগী ইংরেজী ও বাঙ্‌লা নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সভার স্থাপন বঙ্গদেশের একটি প্রধান ঘটনা। কারণ এই সভার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী এদেশে শিক্ষার এক নূতন দ্বার ও নূতন রীতি উন্মুক্ত করিয়াছিল।

১৮১৮ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর হেয়ারের উদ্যোগে স্কুল সোসাইটি নামে আর একটি সভা স্থাপিত হইল। কলিকাতার স্থানে স্থানে নূতন প্রণালীতে ইংরেজী ও বাঙ্‌লা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল। হেয়ার ইহার প্রাণ ও প্রধান কার্য-নির্বাহক ছিলেন। তিনি ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি সেজন্য তাঁহার ঘড়ির ব্যবসায় রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি গ্রে নামক তাঁহার একজন বন্ধুকে ঘড়ির কারবার বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে সহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয়পূর্বক তদুৎপন্ন আয় দ্বারা নিজের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন; এবং অনন্যকর্মা হইয়া এদেশের বালকদিগের শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত হইলেন। ঠনঠনিয়া, কালীতলা, আড়পুলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে তিনি কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া, একখানি পাল্কীতে আরোহণপূর্বক তিনি স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ বর্তমান হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইতেন; প্রথমে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন; তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন,

তাহাদের ভবনে গিয়া তাহাদিগের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন; অবশেষে হিন্দু কলেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন; সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, বলিতে কি, প্রত্যেক বালকের কার্য পরিদর্শন করিতেন; এইরূপে সমস্ত দিন সহরের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; সায়ংকালে বাসভবনে ফিরিয়া যাইতেন। আমরা সেকালের লোকের মুখে



শুনিয়াছি, অনেক বালকের আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ ভবনে হেয়ারের মুখ এত বার দেখিতেন যে, অনেকে তাঁহাকে আপনার লোক মনে করিতেন। স্কুলের বালকদিগের প্রতি হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল,

তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে তাঁহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আর সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্কুলে আসিবার সময় নিম্নশ্রেণীর শিশুদিগের জন্য খেলিবার বল কিনিয়া আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে ঐ বল ঊর্ধ্বে ধরিয়া উদ্বাহু হইয়া শিশুদলের মধ্যে দাঁড়াইতেন; তাহারা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত; কেহ কোমর জড়াইত; কেহ গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা স্কন্ধে ঝুলিত; তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন।

—শিবনাথ শাস্ত্রী

অনুশীলনী

১। ডেভিড্ হেয়ার কোন্ দেশবাসী লোক ছিলেন? বাঙ্গালীদের তিনি অত প্রিয়জন কেন?

২। ডেভিড্ হেয়ারকে 'মহাত্মা' বলা হইয়াছে কেন?—বুঝাইয়া বলিতে পার?

৩। ডেভিড্ হেয়ারের জীবন-কথা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ। লোকটিকে তোমার কেমন লাগে?

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তি অথবা বিষয় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ:—হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, রামমোহন রায়, আত্মীয়-সভা

———

মায়ের ছবি

পাইকপাড়া রাজবাটিতে হড্‌সন্ নামে একজন সাহেব চিত্রকর রাজবাটির কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বদাই সেখানে গতিবিধি ছিল। রাজারা তাঁহাকে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেকালের মূর্তি কত সুন্দর ও হৃদয়মুগ্ধকর ছিল। তাঁহার সে সময়ের প্রতিভায় উদ্ভাসিত মুখের প্রতিকৃতি লইবার জন্য হড্‌সন্ সাহেব বড়ই সাধ্য সাধনা করেন। তিনি প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। পরিশেষে সাহেবের অত্যধিক পীড়া-



পীড়িতে বাধ্য হইয়া সম্মত হন। হড্‌সন্ সাহেব চিত্র প্রস্তুত করিয়া পারিশ্রমিক কিছুই লইতে সম্মত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও সাহেবকে টাকা লওয়াইতে পারেন নাই। রাজারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা

করেন যে, "আমরা এত অর্থ ব্যয় করিলাম, কিন্তু বিনাব্যয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে আমাদের অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট ছবি তুলিয়া দিলে কেন?" সাহেব উত্তরে বলিয়াছিলেন, "টাকার কাজে আর সখের কাজে অনেক প্রভেদ।" বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন সাহেবকে টাকা লওয়ানো কঠিন। লোকটি কিছু শক্ত লোক। তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া ত্বরায় পিতামাতাকে কলিকাতায় আনাইলেন এবং হড্‌সন্ সাহবকে দিয়া বহু অর্থব্যয়ে তাঁহাদের দুইজনের দুইখানি চিত্র প্রস্তুত করাইয়া লইলেন।

পিতামাতাকে কলিকাতায় আনাইয়া জননীকে বলিলেন, "মা, পাইকপাড়া রাজাদের বাড়ীতে একজন খুব ভাল পটো এসেছে, তাহার দ্বারা তোমার একখানি ছবি তুলাইয়া লইতে চাই।"

মা। দুর, আমার আবার ছবি কি হবে, ছি-ছি।

ঈ। ছবি কি তোমার জন্যে! ছবি আমার জন্যে; একখানা ছবি থাকিলে, যখন যেখানে থাকি, প্রাণটা কেমন করলে একবার দেখ্‌বো।

মা। (একথার আর জবাব নাই দেখিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও) তোর যা ইচ্ছা তাই কর্।

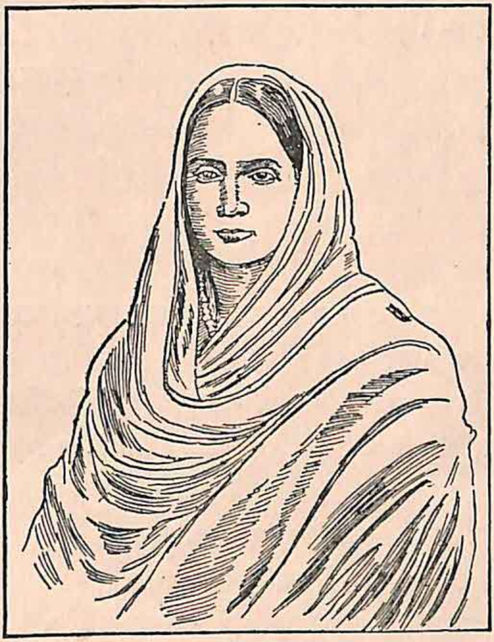
ঈ। সাহেবকে এখানে আন্‌বো, না, তুমি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পারবে?

মা। পটো সাহেব! না বাপু, আমি সাহেবের সামনে ছবি তোলাতে বস্‌তে পারব না।

ঈ। সে খুব ভাল লোক, আমার একখানা ছবি এঁকেছে, তার দাম নেয় ান, আমাকে খুব ভালবাসে, তার সামনে বস্‌তে দোষ নাই।

মা। তা' তোর যা ইচ্ছা কর্, তবে আমি অন্য কোথাও যেতে পার্‌বো না বাবা, যা কর্‌বি এখানে কর্।

ঈ। সেখানে সব যোগাড় আছে। সে আড্ডা ভাঙ্গিয়া এখানে আন্‌তে গেলে হয়ত ছবি ভাল হবে না।



মা। তুই যখন ধরিছিস্, তোকে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বো না। তা' তোর যা ইচ্ছে করগে, গেলেও তোর সঙ্গে যাব ত। নিন্দে হলে লোকে ত আর আমার নিন্দে করবে না, তোরই নিন্দে করবে! বল্‌বে বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়া রাজবাড়ীতে ছবি তুলাইতে নিয়ে গিয়েছে। তোর সঙ্গে যাব।

কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া পিতামাতার ছবি প্রস্তুত করাইলেন, প্রাপ্য অপেক্ষা সাহেবকে কিছু বেশী দিলেন। ছবি দুইখানি প্রস্তুত করাইয়া নিজের গৃহে পছন্দ মত স্থানে বসাইলেন। পিতামাতার জীবদ্দশায় ও তাঁহাদের লোকান্তর গমনের পর যখন যেখানে থাকিতেন আমরণ পিতামাতার মূর্তি সমক্ষে প্রণত হইয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন।

—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। তোমার কাছে তোমার মায়ের ছবি আছে কি? মায়ের একটি ছবি পাইলে তাহা লইয়া তুমি কি কর?

২। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মায়ের ছবি তুলিয়াছিলেন কিরূপে? সেই ছবি লইয়া তিনি কি করিতেন? বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কোন্ গুণটি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে?

৩। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন গল্প জান? অথবা মাতৃভক্তি সম্বন্ধে যে-কোন একটি গল্প বলিতে পার?

৪। উপরের গল্পটির মধ্যে বিদ্যাসাগর-জননীর কি পরিচয় পাও, তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

———

সেবা

সেবা'র কথা উঠ্‌লেই আমাদের সময়কার ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। এখনকার ছেলেরা সেবা বিষয়ে তখনকার ছেলেদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর। আমাদের সময় দেখেছি, যদি কোন ছাত্র ছাত্রাবাসে বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হত, তবে সকল ছাত্র তাকে ত্যাগ করত ; কিংবা মেথর মুদ্দফরাসের জিম্মায় তাকে হাসপাতালে বাস করতে হত। আর এখনকার ছাত্ররা পীড়িতের সেবার্থ পালা করে রাত্রি যাপন করে, বন্যাপীড়িত দুঃস্থ নরনারীর সেবায় প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করতে শিখেছে। এ-সব দেখ্‌লে সত্যই প্রাণে কেমন একটা আনন্দ হয়। ইচ্ছা হয় সেইসব সেবাপরায়ণ ছাত্রদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে।



আজকাল একটা সুর উঠেছে,—ইউরোপের যা কিছু, সবই

পরিত্যাজ্য। কথাটা একটু তলিয়ে বুঝ্লেই আমাদের ভুলটা ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে অনেক সৎকাজ দেখ্তে পাই, যা আমাদের সর্বতোভাবে শিক্ষা করা উচিত। এক লণ্ডন সহরে ৬০।৭০টি হাসপাতাল আছে; সবগুলিই দেশের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কলিকাতায় ত মোটে ছয়টি কি সাতটি হাসপাতাল, তাও আবার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দ্বারা চলে। আমাদের দেশে কত অনাথ বালক প্রতি বৎসর, হয় অকালে নষ্ট হচ্ছে, নয়তো পশুর মত জীবন যাপন করছে। লণ্ডনেই ত কয়টা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর আশ্রম রয়েছে। এদের কেবল পালন করা নয়, যাতে কুপথে না যায়, তার জন্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যাদির দ্বারা এই সব বালকেরা যাতে নিজেদের ও জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারে তারও বিপুল আয়োজন। মূক-বধিরদের শিক্ষা দিবার ত কথাই নাই, এমন কি কুকুরদের জন্যও সেবাশ্রম আছে।

তারপর শিলং, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানের কুষ্ঠাশ্রমের কথা। সে-সবগুলিই তো খৃষ্টান মিশনারিদের। ফাদার ডেমিএন্ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। কুষ্ঠরোগীরা আমাদের জাত ভাই, তাদের সেবার ভার নিলেন বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা। আর আমরা কি করেছি? পরিচয় দিতে গেলে ত এক দেওঘরে একটিমাত্র কুষ্ঠাশ্রমের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের দেশে স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটিও হাসপাতাল, বা সেবাশ্রম নাই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আর ওদের প্রায় সবগুলিই সাধারণের দান দ্বারা পরিচালিত। যখন তাদের অর্থের অনটন হয়, তখন তারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়; আর অমনি একতাড়া অজ্ঞাত হস্তের নোট্ কিংবা চেক্ এসে হাজির হয়, কিংবা কোন ছদ্ম ভিক্ষুকবেশধারী লোক এসে টাকা দিয়ে ছুটে

পালায়,—পাছে লোকে তার নাম জান্‌তে পারে এই ভয়ে। এ রকম নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দান করতে আমরা কয়জন শিখেছি, আর কয়জনই বা মানব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছি। শ্বেতাঙ্গরা জড়বাদী হোক্, কিন্তু তাদের কাছে শেখবার অনেক জিনিস আছে। মানুষ যদি মানুষকে প্রেমবন্ধনে না বাঁধল, যদি তার সেবা করে ধন্য না হ'ল তবে শুধু প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় ফল কি?

—প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অনুশীলনী

১। সেবা বলিতে কি বুঝ? কেবল রোগীর শুশ্রূষাকেই কি সেবা বলে?

২। য়ুরোপীয় জাতির সেবা-ধর্মের দু'একটি পরিচয় দিতে পার? আমাদের দেশে এমনটি দেখিতে পাই না কেন?

৩। য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে সেবা-জগতে আমরা কি কি জিনিস নিতে পারি?

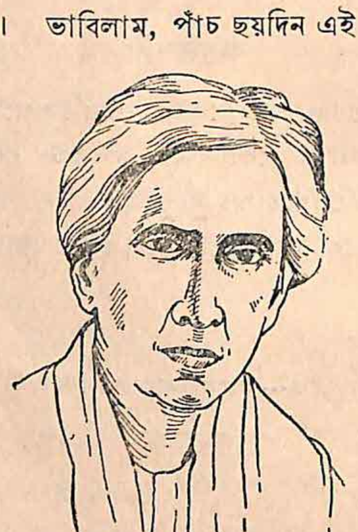
৪। ব্যাখ্যা কর:—

মানুষ যদি মানুষকে… আলোচনায় ফল কি?

———

গৌরী তেওয়ারীর মেয়ে

সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। গুরু-আদেশে আমরা তিনজনেই তিন দিকে ভিক্ষায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা বাড়ীর খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটি বাঙালীর মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তাহার কাপড়খানা যদিচ দেশী তাঁতে বোনা গুনচটের মতই ছিল; কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গীটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায়



সব ঘরেই গিয়াছি; কিন্তু বাঙালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজিও মনে করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, দশ-এগারো বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন-উদাস

চাহনি, আমি আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাংলা করিয়া বলিলাম, চাট্টি ভিক্ষে আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছু বলিল না। তারপরে তার ঠোঁট দুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তারপরে সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ সম্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ-অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া —দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিঃশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—"তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ী কি বর্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন?"

আমি কহিলাম,—"তোমার বাড়ী কি বর্ধমানের রাজপুরে?"

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, "হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ী এসেছি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে, কিছু জানি নে। ঐ যে অশ্বথগাছ,—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ী। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—এরা বলে, না—সে কলেরায় মরেচে।"

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত

দেখ্‌চি পুরা হিন্দুস্থানী অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙালীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাটিতে এদের শ্বশুরবাড়ীটাই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদি গলায় দড়ি দিলে কেন ?"

সে কহিল, "দিদি রাজপুরে যাবার জন্যে দিনরাত কাঁদত, খেত না, শুত না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।"

প্রশ্ন করিলাম, "তোমারও শ্বশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী ?"

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে —আমি ত দিন রাত কাঁদি ; কিন্তু বাবা আমায় চিঠিও লিখে না, নিয়েও যায় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে বিয়ে দিলেন কেন ?"

মেয়েটি কহিল, "আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের বর ওদেশে ত পাওয়া যায় না।"

"তোমাকে কি এরা মার-ধোর করে ?"

"করে না ? এই দেখনা", বলিয়া মেয়েটি বাহুতে, পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।"

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে

লাগিল, "আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বলবে ত? আমাকে একবার নিয়ে যেতে, নইলে আমি—" বলিতে আমি কোন মতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াই দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুকচেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদীর দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম তখন সে কিছু আশ্চর্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। ঠিকানা দিলাম, বর্ধমান জেলার রাজপুর গ্রাম। জানি না, সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কিনা; এবং পৌঁছাইলে সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতদিন পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে, এবং হিন্দু সমাজে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই। যে সমাজ এই দুইটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সেই পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। গৌরী তেওয়ারী কে ছিল,—তাহার বাড়ী কোথায়? তাহার মেয়েদের বিবাহই বা কোথায় হইয়াছিল বলিতে পার কি?

২। বাংলাদেশের তেওয়ারী মেয়ের বর বাংলাদেশে পাওয়া যায় না

কেন ? যাহাদের কথা পর্যন্ত বুঝিতে পারে না, তাহাদের ঘরে, বিদেশী গৌরী তেওয়ারীর মেয়েদের বিবাহ হইয়াছিল কেন,—বুঝিতে পার ?

৩। বিদেশ বিভুঁয়ে গৌরী তেওয়ারীর একটি মেয়ে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিল,—আর একটি মরিতে চাহিয়াছিল। ইহার জন্য দায়ী কে ?—কোন মানুষ, না আমাদের সমাজের কোন নিয়ম ?—তাহার সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কি ?

৪। গোটা গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।

৫। প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :—

প্রসারিত, পঙ্গু, আড়ষ্ট।

———

বাংলার নদ-নদী

বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। এই নদ-নদীগুলিই বাংলার প্রাণ ; ইহারাই বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে,—এখনও করিতেছে। এই নদ-নদীগুলিই বাংলার আশীর্বাদ ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায়, কখনো কখনো বোধ হয় বাংলার অভিশাপও। এই সব নদ-নদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে। সেইহেতু ব-দ্বীপ বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয়, এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায়



সবটাই ভূ-তত্ত্বের দিক্ হইতে নবসৃষ্ট ভূমি। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাংলার নদ-নদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত

খেলাই না খেলিয়াছে! উদ্দাম প্রাণ-লীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মত, মত্ত ঐরাবতের মত ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সহসা খাত পরিবর্তনে কত সুরম্য নগর, কত বাজার-বন্দর, কত মঠ-মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে, আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেশখণ্ডের চেহারা একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে, তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই।

প্রাচীনকালে এই নদ-নদীগুলির প্রবাহ-পথের এবং দুরন্ত প্রাণ-লীলার সঠিক ও সুস্পষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত নাই। তবে, নদ-নদীগুলির প্রবাহ-পথের যে চেহারা, তাহাদের যে আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধিগোচর, প্রাচীন বাংলায় সেই চেহারা, সেই আকৃতি-প্রকৃতি অনেকেরই ছিল না। অনেক পুরাতন পথ মজিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণা, হীনস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে নদীও হারাইয়া গিয়াছে, নূতন নদীর নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব নদ-নদীর ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মনুষ্য-সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা;—মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ বৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম সব কিছুর বিকাশ ইহাদের আশ্রয় করিয়াই। বাংলার শস্য-সম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন,

পশুহীন হয়, আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে সোনা ফলায় পলি ছড়াইয়া, এই পলিই সোনার সার-মাটি। বাঙালী তাই এই নদ-নদীগুলিকে ভয়-ভক্তি যেমন করিয়াছে, ভালও তেমনি বাসিয়াছে; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনি ভালবাসিয়া নাম দিয়াছে ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ), চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা (মেঘনাদ বা মেঘানন্দ), সুরমা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)। বস্তুতঃ বাংলার, শুধু বাংলারই বা কেন, ভারতবর্ষের নদ-নদীগুলির নাম কি সুন্দর অর্থ ও ব্যঞ্জনাময়!

বাংলার এই নদ-নদীগুলি সমগ্র পূর্ব-ভারতের দায় ও দায়িত্ব বহন করে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র,—উত্তর-ভারতের প্রধানতম এই দুইটি নদীর বিপুল জলধারা ও পলিপ্রবাহ এবং পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টিপ্রবাহ বহন করিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় বাংলার কমনীয় মাটিকে। সেই মাটি সর্বত্র এই সুবিপুল জলপ্রবাহ বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই জলপ্রবাহ নূতন মাটি যেমন গড়ে, মাঠে শস্য যেমন ফলায়, তেমনি ভূমি ভাঙে ও শস্য বিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভরে পদ্মাকে বলিয়াছে কীর্তিনাশা; পদ্মা বাঙালীর অনেক কীর্তিই নষ্ট করিয়াছে সত্য,—করিবে না-ই বা কেন? গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সুবিপুল জলধারা নিম্নতম প্রবাহে সে একা বহন করে, তাহাতে আসিয়া নামে প্রচুর বৃষ্টিপ্রবাহ, নিম্ন-ভূমির সাগরপ্রমাণ বিল হাওরের অগাধ জলরাশি। দুর্দম মত্ততার অধিকার তাহার না থাকিলে থাকিবে কাহার? অথচ পদ্মা-মেঘনাই

তো আবার স্বর্ণশস্যের আকর ; এই পদ্মা-মেঘনার দুই তীরেই তো ঘনতম মনুষ্য বসতি, সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের লীলা।

—নীহাররঞ্জন রায়

অনুশীলনী

১। বাংলাদেশের কোন্ কোন্ নদী তুমি দেখিয়াছ? তাহাদের নাম করিতে পার? তোমার অভিজ্ঞতা হইতে বাংলার একটি নদীর বর্ণনা দাও।

২। বাংলাদেশের নদীগুলি একদিক হইতে বাঙালীর সম্পদের হেতু, আর একদিকে বাংলামাটির ধ্বংসের কারণ ;—উদাহরণ দ্বারা এ-কথা প্রমাণ করিতে পার? কেন এমনটি হয় বুঝাইয়া বলিবে?

৩। অর্থ বুঝাইয়া বল :—ভূ-তত্ত্ব, নবসৃষ্ট, ভূমি, খাত, কমনীয় ভূমি, ব-দ্বীপ বঙ্গ, বিল-হাওর।

মহাস্থবির শীলভদ্র

হিউয়েন্ সাঙ্ চীনদেশের বৌদ্ধপণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময়ে জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙালী। ইহা বাঙালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

ইঁহার নাম শীলভদ্র, ইনি দক্ষিণ বঙ্গের এক রাজার ছেলে। যখন হিউয়েন্ সাঙ্ ভারতবর্ষে আসেন, তখন ইনি নালন্দা-বিহারের অধ্যক্ষ। বড় বড় রাজা, এমন কি সম্রাট্ হর্ষবর্ধন পর্যন্ত, তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন। কিন্তু তাহা পদের গৌরব—মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। হিউয়েন্ সাঙ্ বলিয়া গিয়াছেন—"নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ-শাস্ত্রের ও বৌদ্ধ-যোগের গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া আমার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে।"

শীলভদ্র মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদিগের সমস্ত শাস্ত্রও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার সম্পূর্ণ অধিগত ছিল, এবং সে-সময়ে উহার যে-সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণদের আদিগ্রন্থ যে বেদ, তাহাও শীলভদ্র চৈনিক ছাত্রকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্ব-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি ছিল মনের উদারতা।

হিউয়েন্ সাঙের পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন—"চীন একটি মহাদেশ, ইনি ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্ধর্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।"

আবার যখন ভাস্করবর্মা হিউয়েন্ সাঙ্‌কে কামরূপ যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন শীলভদ্র বলিলেন—"কামরূপে এখনও বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধধর্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ব্যাপারে শীলভদ্রের ধর্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতি-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বাল্যকাল হইতেই শীলভদ্রের বিদ্যার অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হ'ন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল তখন সর্বময় কর্তা। তিনি ধর্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে ধর্মপালের সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময়ে দক্ষিণাপথ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন।

শীলভদ্র বলিলেন—"আপনি কেন যাইবেন?"

তিনি বলিলেন—"বৌদ্ধধর্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে,

বিধর্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর না করিতে পারিলে সদ্ধর্মের উন্নতি নাই।"

শীলভদ্র বলিলেন—"আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।"

শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী হাসিয়া বলিলেন—"এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে ?"

কিন্তু শীলভদ্র অতি সহজেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। তিনি শীলভদ্রের না করিতে পারিলেন যুক্তি-খণ্ডন, না দিতে পারিলেন কোনও বচনের উত্তর, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন।

শীলভদ্র বলিলেন—"আমি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব ?"

রাজা বলিলেন—"বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতিঃ ত বহুদিন নির্বাণ পাইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম কিরূপে রক্ষা পাইবে ? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই দান অগ্রাহ্য করিবেন না।"

তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজি হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সংঘারাম নির্মাণ করিয়া দিলেন।

হিউয়েন্ সাঙ্ এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ-কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি

যে সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়াছেন, তাহা অতি বিশদ ও তাহার ভাষা অতি সরল।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অনুশীলনী

১। হিউয়েন্ সাঙ্ কে ছিলেন, জান কী? তাঁহার ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া বল।

২। মহাস্থবির শব্দের অর্থ কি? শীলভদ্রকে মহাস্থবির বলা হইয়াছে কেন?

৩। শীলভদ্রের জীবনী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। শীলভদ্রের চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলী বিশদ করিয়া বল। তাঁহার চরিত্রের কোন্ গুণটি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে এবং কেন?

৫। নিম্নলিখিত ব্যক্তি অথবা বিষয় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ—
নালন্দা-বিহার, মহাযানী বৌদ্ধ, পাণিনি, বোধিসত্ত্ব, সংঘারাম।

———

শক্তুদাতা ব্রাহ্মণ

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ,—সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মরাজের যশ সর্বদিকে ঘোষিত হ'ল এবং আকাশ থেকে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল তখন এক বৃহৎ নকুল যজ্ঞসভায় এল। তার চক্ষু নীল এবং মস্তক স্বর্ণবর্ণ। সে ধৃষ্টভাবে বজ্রকণ্ঠে বললে, ওহে নরপতিগণ, কুরুক্ষেত্র-বাসী এক উঞ্ছজীবী বদান্য ব্রাহ্মণ যে শক্তুদান করেছিলেন, তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুলের এই কথা শুনে ব্রাহ্মণরা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন এই যজ্ঞের নিন্দা করছ?

নকুল হাস্য ক'রে বললে, দ্বিজগণ, আমি মিথ্যা বলিনি, দর্প ক'রেও বলিনি। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। একটা দারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে তাঁর সঞ্চয় শূন্য হ'য়ে গেলে তিনি অতি কষ্টে কিঞ্চিৎ যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শক্তু প্রস্তুত করলেন। জপ, আহ্নিক ও হোমের পর ব্রাহ্মণ সপরিবারে ভোজনের উপক্রম করছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণ এসে আহার চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথিকে সাদরে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শক্তুর ভাগ নিবেদন করলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী বললেন, তুমি এঁকে আমার ভাগ দাও।

ব্রাহ্মণ তাঁর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত শীর্ণ বৃদ্ধা পত্নীকে বললেন, তোমার ভাগ আমি নিতে পারি না; কীট-পতঙ্গ-মৃগাদিও নিজের স্ত্রীকে

পোষণ করে। ধর্ম-অর্থ-কাম, সংসারকার্য, সেবা, সন্তানপালন সবই ভার্যার সাহায্যে হয়, ভার্যাকে পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহ্মণী শুনলেন না, নিজের শক্তু অতিথিকে দিলেন; অতিথি তা খেলেন। কিন্তু তথাপি তাঁর তৃপ্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, পুত্র, তোমার বয়স যদি সহস্র বৎসরও হয় তথাপি তুমি আমার দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আমি অতিথিকে দিতে পারব না। ব্রাহ্মণ-পুত্র আপত্তি শুনলেন না, নিজ অংশ অতিথিকে দিলেন। তথাপি তাঁর ক্ষুধা দূর হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের সাধ্বী পুত্রবধূ নিজ অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, কল্যাণী, তোমার দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ; তুমি ক্ষুধার্ত হ'য়ে আছ, তুমি অনাহারে থাকবে এ আমি কি ক'রে দেখব? পুত্রবধূ শুনলেন না, অগত্যা ব্রাহ্মণ তাঁর অংশও অতিথিকে দিলেন।

তখন অতিথিরূপী ধর্ম বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার শুদ্ধ দান পেয়ে আমি প্রীত হ'য়েছি; ওই দেখ, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে; দেব, গন্ধর্ব, ঋষি প্রভৃতি তোমার দান দেখে বিস্মিত হয়ে স্তব করছেন; ক্ষুধায় প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন এবং স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহ অতিক্রম ক'রে নিজ কর্ম দ্বারা স্বর্গলোক জয় করেছ। শক্তু দান ক'রে তুমি যে ফল পেয়েছ বহুশত অশ্বমেধেও তা হয় না। দিব্যযান উপস্থিত হয়েছে, তুমি এতে আরোহণ ক'রে পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত ব্রহ্মলোকে যাও।

অতিথিরূপী ধর্ম এইরূপ বললে ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বর্গে গেলেন।

তখন আমি গর্ত থেকে নির্গত হ'য়ে ভূ-লুণ্ঠিত হলাম। সিক্ত শক্তুকণার গন্ধে, দিব্য পুষ্পের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহ্মণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক কাঞ্চনময় হ'ল। আমার অবশিষ্ট দেহও ঐরূপ হবে এই আকাঙ্ক্ষায় আমিও তপোবন ও যজ্ঞস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করছি। আমি আশান্বিত হয়ে কুরুরাজের এই যজ্ঞে এসেছি, কিন্তু আমার দেহ কাঞ্চনময় হ'ল না। এই কারণেই আমি হাস্য ক'রে বলেছিলাম যে, সেই উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণের শক্তুদানের সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুল এই কথা বলে চলে গেল।

—রাজশেখর বসু

অনুশীলনী

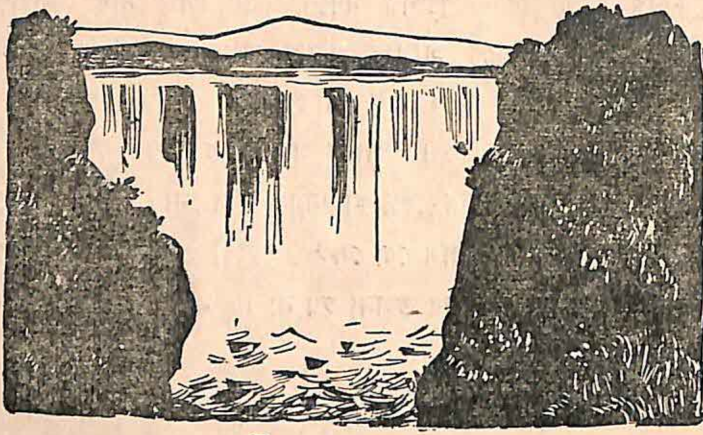
১। 'অতিথি-সেবা' বলিতে কি বুঝ? কেবল ভাল খাইতে পরিতে দিলেই কি 'অতিথি-সেবা'র চরম হয়? নিজের অভিজ্ঞতা অথবা কল্পনা হইতে সার্থক অতিথি-সেবার একটি গল্প বল।

২। উপরের অতিথি-সেবার গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

৩। নকুল বলিয়াছিল, উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণের শক্তুদানের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞেরও তুলনা হয় না। ইহার কারণ বুঝাইয়া বলিতে পার?

৪। অর্থ বিশদ কর :—

অশ্বমেধ, যজ্ঞ, উঞ্ছজীবী, শক্তু, প্রজ্ঞা, দিব্যযান।



রামধনুর দেশে

পৃথিবী আগে ছিল মস্ত বড়,—তা'র আদি, অন্ত যেন ছিল না। এযুগে উড়োজাহাজের কৃপায় জানা গেছে পৃথিবী এমন কিছু বড় নয়। মাত্র সাতদিনে পৃথিবী-ভ্রমণ শেষ করা যায়। তা ছাড়া এ যুদ্ধে দেখা গেল, মানুষের অসাধ্যও যেমন আর কিছু নেই, তেমনি দুর্গম ব'লেও আর কিছু এর পরে থাকবে না। জার্মানি থেকে বোমা গিয়ে পড়ে ইংলণ্ডে, মানুষের বুদ্ধি আর গবেষণা দূরত্ব আর দুর্গমকে জয় করার জন্য যুগ-যুগান্তর থেকে সাধনা ক'রে চলেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বড়ই হোক, সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের পিপাসা কোনও যুগে বদলাবে কিনা এখনও বলা কঠিন। আমরা আজও বিরাট হিমালয় দেখে যেমন অভিভূত হই, বিশাল সমুদ্র দেখে তেমনি স্তব্ধ হয়ে থাকি। কোথায় সুন্দর পারিজাত

কানন, কোথায় আগ্নেয়গিরির আশ্চর্য দৃশ্য, কোথায় অগাধ সাগরের মাঝখানে রক্তপ্রবাল-দ্বীপে পুষ্পোদ্যান—এগুলি আমাদের কাছে আজও অপরূপ। আজ এমনি একটি দৃশ্যের বর্ণনা করব।

সেটি হ'ল আফ্রিকার ভিক্‌টোরিয়া জলপ্রপাত। এই বিরাট জল-প্রপাত যে ভূভাগটির সম্পদ—এই ভূভাগের নাম হ'ল রামধনুর দেশ। সেখানকার আকাশ আর শূন্যলোক চিরদিন রামধনুর বিচিত্র



বর্ণসজ্জায় ভ'রে থাকে। সূর্যের আলোর সঙ্গে বায়ুস্তর আর জলকণার মিশ্রণে সেই রামধনুগুলি পলকে-পলকে নতুন আকার ধারণ করতে থাকে। ঠিক যেন মনে হয় শূন্যলোকে আকাশের দেবতারা নেমে এসে শত শত ধনুর্বাণ নিয়ে নিঃশব্দে তীর ছোঁড়াছুড়ি করছেন এবং সেখানে একটি অস্থির চঞ্চল জয়-পরাজয়ের খেলা চলেছে!

সুদূর আফ্রিকার জাম্‌বেসি নদীর ধারে এই ভিক্‌টোরিয়া জলপ্রপাত ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে যিনি আবিষ্কার করেন, তিনি ইতিহাসের সেই সুবিখ্যাত মিশনারী ইংরেজ ডাঃ লিভিংস্টোন। তাঁর আগে আর কোনও শ্বেতচর্মী আফ্রিকার এই ভূভাগে পদার্পণ করেন নি, অথবা এই প্রপাতও দেখেন নি। লিভিংস্টোন যাবার আগে আফ্রিকার স্থানীয় আদিবাসীরা এই জলপ্রপাতটিকে বলত, 'মসিওয়াটুনিয়া' অর্থাৎ সঙ্গীতময় ধূম্রজাল!

একবার এক সময়ে ডাঃ লিভিংস্টোন এক বিশালকায় সিংহের কবলে পতিত হ'ন। সিংহটি তাঁকে সহসা অতর্কিতে আক্রমণ করে, এবং তাঁকে পায়ের তলায় ফেলে তাঁর একটি বাহু চিবোতে থাকে,—তাঁর বাহুর হাড়ভাঙার শব্দ পর্যন্ত যেন বহুদূর থেকে শোনা যায়।—তবে বিস্ময়ের কথা, হৈ-হট্টগোলে সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়ে যান। সেই থেকে তাঁর ভাগ্যের চাকা একটু ঘুরে দাঁড়ায়। এই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে দেবদূত ব'লে মনে করে এবং সেই থেকে সেই বর্বর অধিবাসীদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেতে থাকেন।

পরিব্রাজক লিভিংস্টোন অতঃপর আবার অভিযান সুরু করেন।

এবার এই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের একটুখানি ব্যক্তিগত পরিচয় দেব। ভবিষ্যতে অনেক বড় হবে,—এমন অনেক লোক নিতান্ত সামান্য হয়ে জন্মগ্রহণ করে। একদা যে ব্যক্তি সমগ্র ইংলণ্ড ও জগতে 'সিংহ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তরুণ বয়সে তিনি চরকায় সূতো কাটতেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তিনি ছাত্র ছিলেন, এবং অনেকে জানত তিনি চিকিৎসকের পেশা নিয়ে যাবেন এখানে-ওখানে। কিন্তু পাশ করার পর ঘটনাচক্রে গভর্ণমেণ্টের কাজের

সহায়তার জন্য ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হয়—উদ্দেশ্য, সেখানকার কুরুমান-অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় বেচুয়ানাদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা।

কুরুমান-অঞ্চলে গিয়ে লিভিংস্টোন হঠাৎ একদিন তাঁর সঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে ছয় মাস ধ'রে সেখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে দিন যাপন করেন। তাদের সংস্কার, ভাষা, অভ্যাস, বিশ্বাস—এ সমস্ত তিনি নিখুঁতভাবে জানতে চান—এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ধর্মোপদেশ প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু এ সকল কাজে লিপ্ত থাকলেও তাঁর মন প'ড়ে থাকে ভ্রমণের দিকে—নতুন দেশকে জানবার, নতুন মানুষের সমাজকে বোঝবার এবং দুর্গমকে জয় করবার বাসনা তাঁর মনে নিত্য জাগরূক থাকত। সে বাসনা এত তীব্র ও আন্তরিক যে, তিনি স্বদেশে ফিরবার নাম করতেন না।

প্রায় নয় বছর এইভাবে কাটিয়ে লিভিংস্টোন একদল তরুণ দুঃসাহসীকে নিয়ে আবার একদিন আফ্রিকার দুর্গম ভূভাগের দিকে অভিযান আরম্ভ করেন। সে অঞ্চলে ভ্রমণ অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং তৃষ্ণার জল পেতে হ'লে আদিবাসীরা বালুমাটি দুই হাতে তুলে তবে নীচের থেকে জল বা'র করত। কোন অস্ত্রদ্বারা মাটি অথবা বালু খোঁড়া তারা পাপ ব'লে মনে করে। জল সেই ভূভাগে ভারি দুষ্প্রাপ্য। দুর্গম আফ্রিকার ঠিক সেই মধ্যকেন্দ্র-ভূমিতে একদিন লিভিংস্টোনের দল দূরে একটি বৃক্ষচ্ছায়াময় জলাশয় লক্ষ্য ক'রে যখন দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,—দেখা যায় সেটি একটি মরীচিকা মাত্র। সেদিন ব্যর্থতার হতাশায় তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা নব-নব দেশ, নদী ও পর্বত ইত্যাদি আবিষ্কার করতে থাকেন। পরবর্তী কালে তাঁদের রচিত মানচিত্র

অনুসরণ ক'রে বহু ব্যবসায়ী ও অভিযানকারী সুবিধা লাভ করেন এর প্রায় দু'বছর পরে লিভিংস্টোন আফ্রিকার মধ্যভাগে জাম্বেসি নদী আবিষ্কার ক'রে পৃথিবী-বিখ্যাত হ'ন।

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর এইভাবে তিনি অরণ্যে, পর্বতে, নদীতীরে এবং আদিবাসীদের বসতির আশেপাশে ভ্রমণ ক'রে বেড়ান। অতঃপর যেদিন কেপ্‌টাউনে তিনি এসে উপস্থিত হ'ন, সেদিন সভ্য জগতের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু স্বদেশে ফেরবার কোনও মোহ অথবা লোভ তাঁকে বশীভূত করতে পারে নি,—তিনি কেপ্‌টাউন থেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলি রসদ ও জ্যোতির্বিদ্যা আয়ত্ত করার কতকগুলি উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আবার তাঁর সেই ক্লান্তিকর যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। বেচুয়ানায় তাঁর সেই নির্জন আশ্রমটি তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাক্‌তে থাকে।

এই সময়ে বুয়োর জাতি নানাবিধ উৎপাত করতে থাকে এবং বৃটিশের সঙ্গে তাদের এখানে ওখানে সংঘর্ষ বাধে। মাঝখানে একটি চুক্তির ফলে যখন বৃটিশ প্রভাব সেখান থেকে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়, সেই সময় সহসা একদিন বুয়োররা লিভিংস্টোনের ঘাঁটি আক্রমণ করে, কতকগুলি লোককে হত্যা করে এবং তারপর তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুইশত ছেলে-মেয়েকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস ক'রে রাখে। তারা লিভিংস্টোনের ঘরবাড়ী নষ্ট করে, তাঁর লাইব্রেরী ধ্বংস করে, তাঁর ঔষধপত্র তচনচ ক'রে দেয়, এবং তাঁর যথাসর্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে চ'লে যায়।

লিভিংস্টোন এতে পরাজয় স্বীকার করেন নি। তিনি অধিকতর উদ্যমে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি একবার

বিলাতে আসেন। কিন্তু তার পর থেকে তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তি যেন নতুন বেগে ফিরে আসে। তিনি আগে ছিলেন এক মিশনারী, কিন্তু এবার থেকে একজন পাকা অভিযানকারী হ'য়ে ওঠেন। কষ্টসাধ্য, ভ্রমণ ও অভিযান,—তিনি একা অসীম শক্তির সঙ্গে চালিয়ে যেতেন। তাঁর একমাত্র কল্পনা—অরণ্যের দুরূহ গহ্বর-লোকে গিয়ে তিনি সভ্যতার আলো জ্বালাবেন। বুয়োরদের শত্রুতা, জলহীন মরুভূমি, দাস-ব্যবসায়ী লোভী আরব দস্যু, জলাভূমির রোগ-বীজাণু এবং দু'কূলপ্লাবী নদীর ধারা,—এরা ছিল তাঁর অভিযানের পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধা। কিন্তু তবু তিনি অগ্রসর হ'ন, এবং একে একে ভূগোলের বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও আবিষ্কার করতে থাকেন। বিশাল হ্রদ, বিরাট জলপ্রপাত, অজানা পর্বতরাজি, এবং অনাবিষ্কৃত নদ-নদী—এ সব দেখতে দেখতে তিনি চ'লে যান। আজ সমস্তই লিভিংস্টোনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সত্যি বলতে কি, মধ্য-আফ্রিকা ভূভাগটি যে ইউরোপের কাছে আজ এত পরিচিত, এ কেবল সেই আদর্শবাদী মিশনারীটির জন্যই। রোগে তিনি বিবশ, দুর্বলতায় শীর্ণ—তবু তিনি বনে বনে, পর্বত-কান্তারে এবং পথে পথে ঘুরেছিলেন।

বহুদিন এইভাবে অতিবাহিত করার পর লিভিংস্টোন তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম সার্থকতার পথে এগিয়ে আসেন। মধ্য দেশের দুর্গম অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যাবার পথে তাঁর একমাত্র চিন্তা হ'ল, যদি সমুদ্রের সঙ্গে কোনও একটা পথের যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি জগতের অন্যতম বিস্ময় আবিষ্কার করেন।

সেখানকার আদিম অধিবাসীরা কোনও বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না ; তারা যেমনই নিস্পৃহ, তেমনি নিরাসক্ত। কিন্তু তারাই মধ্যে মধ্যে লিভিংস্টোনকে বলত, অমুক অঞ্চলে এক রকম ধোঁয়া দেখা যায়, কিন্তু সেই ধোঁয়ার ভিতরে কেমন যেন একটা সুরের ধ্বনি শোনা যায়! ব্যাপারটা কি, তা' তারা কিছু জানে না। লিভিংস্টোন সেই অঞ্চলে যাবার সুবিধা পেয়ে এবার সেখানকার তদন্ত আরম্ভ করেন।

প্রথম সেই বিরাট জলপ্রপাতের দৃশ্য বর্ণনায় লিভিংস্টোন বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় দীর্ঘ বাষ্পোদগম,—সেটা বাস্তবিকই ধোঁয়ারই মতন। আফ্রিকায় যেমন মাঝে-মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের আগাছায় আগুন জ্বালানো হয়—ঠিক সেই রকম এই ধূম্রবাষ্প পাঁচ ছয় মাইল দূর থেকে নজরে পড়ে। ধীরে-ধীরে দেখা যায়, সর্বসমেত পাঁচটি দীর্ঘাকার বাষ্পের মণ্ডলী উপর দিকে উঠে বাতাসের দিকে প্রবাহিত হয়,—সেগুলি যেন নীচের দিকে বিশ্রাম ক'রে রয়েছে বৃক্ষজটলার সীমারেখায়। ধূম্রমণ্ডলীর অগ্রভাগ মিশে গেছে মেঘের সঙ্গে। নীচের দিকে সেগুলো শাদা, ওপরদিকে ছায়াময় কালো, সুতরাং ধোঁয়ার মত দেখা যায় বৈ কি!

লিভিংস্টোন অভিভূতের মতন ধীরে-ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। বিহঙ্গ-কাকলীগানের সঙ্গে দূরের সুরের ঝঙ্কার, রঙীন মেঘের দল জল-কণিকার সস্নেহ স্পর্শ,—মনে হয়, তিনি যেন স্বর্গের পারিজাত-কাননের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলেছেন।

পারিপার্শ্বিক ভূভাগের সৌন্দর্য কী অপরূপ! নদীর দুই তীরে বৃক্ষলতাবিতান ও বিচিত্র সুন্দর সুগন্ধি ফুলের কী শোভা! আর মাঝে-

মাঝে সেই জাম্বেসি নদীর মাঝখানে ছোট ছোট সুন্দর খেলাঘরের দ্বীপ। তিনি একটি ছোট নৌকাযোগে নদীর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকেন। ভাসতে-ভাসতে এক সময়ে সেই বিশাল জলপ্রপাতের ঠিক ওষ্ঠপ্রান্তে এসে উপস্থিত হ'ন। তিনি সেই জায়গার বর্ণনা ক'রে বলেন, প্রায় আধ মাইল চওড়া একটি জলস্রোত প্রায় একশো ফিট উঁচু থেকে সেখানে দুরন্ত বেগে নেমে এসে সহসা একটি পনেরো-কুড়ি গজ নালার মধ্যে ঢুকে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে ছুটেছে!

তাঁর সেই অভিভূত অবস্থা কেটে যাবার পর তিনি প্রথম দিন সেখান থেকে ফিরে আসেন। দ্বিতীয় দিন আবার তার ধারে যান। এবার দেখলেন জলপ্রপাতটি অন্ততঃ একমাইল চওড়া, এবং সেটি নামছে কম-সে-কম চারশো ফিট উঁচু থেকে, এবং একটি ফাটলের জল প্রায় একশো ফিট বিস্তৃত। সমস্ত জলধারাটা ত্রিশ চল্লিশ গজ নালার ভিতর দিয়ে দৌড়য়—তারপরে সেটি ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হ'য়ে নদী সৃষ্টি করে। সমস্তটাই সরীসৃপের মতন আঁকা-বাঁকা, ঘোরা-ফেরা। যখন সেই জল আছড়ে পড়ে, তখন সেটা শুভ্র তুষারের মতো ফেনার সৃষ্টি করে। চারিদিকে রক্তবর্ণ পর্বতের গাত্র একটি পটভূমিকার মতো দেখায় এবং তাদেরই চতুষ্পার্শ্বে নীল, সবুজ নানা বর্ণের বৃক্ষলতা ও শাকসব্জির অপরূপ সমারোহ। লাল, গোলাপী, ঘন লালাভ পীত ইত্যাদি বর্ণের অফুরন্ত শোভাযাত্রা। লিভিংস্টোন এই মনোরম দৃশ্যের অবতারণা ক'রে বলেছেন, হয়ত অপ্সরী-কিন্নরীরা এইখানে এসে বিচরণ ক'রে যায়!

একদিন লিভিংস্টোন সমুদ্রগামী পথ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর সেই আবিষ্কারের ফল হ'ল—ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা সুবিধা পেয়ে সেই পথে ক্রীতদাস চালান দিতে লাগল। সেখানে দিকে দিকে সেই

ব্যবসায়ীদের অনাচার আর উৎপীড়নের চিহ্ন দেখে তিনি অতিশয় বেদনা বোধ করেন ;—তিনি নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হ'ন।

এই প্রকার দুরবস্থা, তার উপর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। মানুষের কল্যাণের কাজে এসে তিনি দেখেন, কল্যাণ অপেক্ষা অমঙ্গলই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক আঘাত পান, যেদিন তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ জাম্বেসি নদীর তীরে সমাধিস্থ করেন। সুতরাং ভগ্নমনে তিনি সদলবলে আর একবার আফ্রিকা ত্যাগ করেন। আর কোথাও কোন সুবিধা না পেয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব জাহাজখানি নিজের হাতে চালিয়ে ভারতের উপকূলে বোম্বাই বন্দরে নিয়ে আসেন। তখন সমুদ্রপথে অভিযান করার জন্য দিক্-নির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি—ডাঃ লিভিংস্টোন আকাশের তারকা ও জ্যোতিষ্ক-লোকের গ্রহ, উপগ্রহ বিচার ক'রে নির্ভুল পথে ভারত সাগর পেরিয়ে আসেন।

পুনরায় তিনি বিলাত হ'য়ে আফ্রিকায় ফিরে যান, কারণ আফ্রিকার নিঃশব্দ আহ্বান তিনি ভুলতে পারেন নি। কিন্তু সেই তাঁর শেষযাত্রা। দুর্ভাগ্য, বিপদ, উৎপীড়ন, দুর্যোগ—এসব তাঁকে ছাড়েনি, কিন্তু তাঁর অদম্য প্রাণ, অপরিমেয় অধ্যবসায়। এবারের অভিযানও তাঁর ঘটনাবহুল। কিন্তু এই সময় তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে।

সেটা বর্ষাকাল, চারিদিক স্যাঁতসেঁতে এবং জলে ডোবা,—তার ওপর খাদ্য দুষ্প্রাপ্য। লিভিংস্টোনের অনুচরেরা বিধিমতে তাঁর সেবা করে, তাঁকে আনন্দ দেবার চেষ্টা পায়। তারা ডাল-পালা ও বাঁকারির সাহায্যে একটি খাট প্রস্তুত ক'রে তাঁকে শোয়ায়, আর পাহারা দেয়। কিন্তু এই মহৎ জীবনের অন্তিম কাল তখন ঘনিয়ে এসেছিল।

অবশেষে একদিন শেষরাত্র চারটের সময় তাঁর একটি সেবক উঠে দেখে,—লিভিংস্টোন সেই বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে হাত দুটি জোড় ক'রে প্রার্থনার ভঙ্গীতে প'ড়ে আছেন, কিন্তু তখন তিনি পরলোকগত।

আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যলোকে লিভিংস্টোনের সমাধি এখনও রয়েছে একটি গাছের তলায়,—সমগ্র আফ্রিকা সকৃতজ্ঞ আনন্দ-বেদনায় তাঁর সমাধির কাছে এখনো এসে দাঁড়ায়। তাঁর হৃদয় ওখানকার মাটির নীচে আজও প্রোথিত রয়েছে।

—প্রবোধকুমার সান্যাল

অনুশীলনী

১। রামধনু দেখিয়াছ? তাহাতে কি কি রং দেখিতে পাও? রামধনুর দেশ কোথায়,—ঐ দেশকে রামধনুর দেশ বলা হয় কেন?

২। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কে আবিষ্কার করেন? তাঁহার জীবন-কথা নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

৩। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতও তাহার চারিপার্শ্বের প্রকৃতির বর্ণনা নিজের কথায় লিখ। ইহা তোমার কেমন লাগে?

৪। দুর্গম দেশের অভিযানে যাইতে তোমার ইচ্ছা করে কি? অনুরূপ অভিযানে বিখ্যাত হইয়াছেন, এমন কোন ভারতীয়ের নাম জান? অভিযাত্রী লিভিংস্টোনকে তোমার কেমন লাগে,—বিশদ করিয়া লিখ।

৫। অর্থ বুঝাইয়া বল :—

মিশনারী, অভিযাত্রী, আদিবাসী, ক্রীতদাস, 'মসিওয়াটুনিয়া', মরীচিকা, বুয়োর জাতি, অপ্সরী-কিন্নরী।

৬। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) চারিদিকে রক্তবর্ণ পর্বতের গাত্র···অপরূপ সমারোহ।

জাপান

১৬ জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টি বাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্র-যাত্রীদের ইসারা করছে—কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপসা।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে ভিড়লো, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে। বড় বড় জাপানী অপ্সরা-নৌকা আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য করছে।

জাপানের শহরের রাস্তায় বেরোলেই একটা জিনিস চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা শুদ্ধ কাঁদে না। আমি এ পর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে,—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিকল মোটরের উপর এসে পড়বার উপক্রম করলে—আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিকল-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না

দিয়ে থাকতে পারতো না। কিন্তু এখানে এরূপ অবস্থায় মোটর-চালক ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। এখানকার বাঙ্গালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিকল, কিংবা গাড়ির সঙ্গে বাইসিকলের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনও উভয় পক্ষে চেঁচামেচি, গালমন্দ না করে, গায়ের ধূলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানী বাজে চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বল-ক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে-খরচ নেই বলে এখানে প্রয়োজনের সময় শক্তির টানাটানি পড়ে না। শরীর-মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করে রাখতে জানে।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে রাখা—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক,—উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট। সেইজন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনিনি। এদের হৃদয় ঝরণার মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। সেইজন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়।

কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কতো আয়োজন, কতো চিন্তা, কতো নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর ফুল সাজাবার বেলায় মন দিতে হয়।

একটা বইয়ে পড়েছিলুম, প্রাচীনকালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশ কালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যা আলোচনা

করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণ-দক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকে বুঝতে পারবে, জাপানী নিজের এই সৌন্দর্য অনুভূতিকে সৌখীন জিনিস বলে মনে করে না, ওরা জানে এতে মানুষের শক্তি-বৃদ্ধি হয়।

জাপানের ঘরগুলিতে আসবাব নেই বললেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ সমস্ত ঘর কী একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্ করছে। একটিমাত্র ছবি, কিংবা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। যে জিনিস যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিসকে ঘেঁসাঘেঁসি করে রাখা তাদের অপমান করা। এইরকম দুটি একটি ভালো জিনিস দেখালে, সে যে কি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম।

অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপ-রসের যে বোধ দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সর্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত,—কিন্তু এমনতরো সর্বজনীন রস-বোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে এরা কি বিলাসী হয়েছে? অকর্মণ্য হয়েছে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিংবা অক্ষম হয়েছে? ঠিক তার উল্‌টো। এরা সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে, এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য, কর্মনৈপুণ্য লাভ করেছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। জাপান দেশের নাম শুনিয়াছ? জাপান অথবা জাপানীদের সম্বন্ধে কোন গল্প তোমার জানা আছে?

২। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "জাপানের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।"—ইহার অর্থ বোঝ? কবি জাপানীদের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার সঙ্গে এ কথার কোন মিল আছে?

৩। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া জাপানী জাতির বৈশিষ্ট্য নিজের ভাষায় লিখ।

৪। "এরা সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে, এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য, কর্মনৈপুণ্যলাভ করেছে।"—এ কথার অর্থ নিজের ভাষায় গুছাইয়া বল। সৌন্দর্যসাধনা হইতেই বীর্য এবং কর্মনৈপুণ্য লাভ করা যায়,—একথা মান কি?



প্রার্থনা

আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চির জনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো,
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নিচে।
প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না তো, রইব চেয়ে—
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। অর্থ বুঝিয়া কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবি ভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন? ভগবানের নিকট তোমার কোন প্রার্থনা আছে কি? কবির প্রার্থনার সঙ্গে তোমার প্রার্থনার কোন মিল আছে?

৩। ভগবানের নিকট হইতে কি আমাদিগকে দূরে রাখে?—কিরূপে?

৪। ব্যাখ্যা কর :—চির জনম এমন করে······পায়ে তব।

———

নিশীথ গগন

উদার অসংখ্য তারা ফুটিয়াছে গগনে,
বচনে বলিতে নারি, শুধু দেখি নয়নে।
মন যে কেমন করে, প্রাণ ধায় শূন্য 'পরে,
তোদের তারকা আমি কেন ভালবাসিরে,
একেলা দুপুর রেতে ছাদে ব'সে হাসিরে।
চারিদিক্ কি গভীর, কারো সাড়া নাহি পাই,
তবে কি জগতে আর জনপ্রাণী কেহ নাই।
চাঁদের ছেলের মত ফের্ আলো করে কে রে,
জুড়াতে জীবন বুঝি শশী রেখে গেছে এরে।
চাঁদের সাধের বাছা, আয় তুই নেমে আয়,
কি নাম নক্ষত্র তোর জানিতে হৃদয় চায়,
শতবর্ষ আজি যদি না জন্মিত মানবেরা,
হইত শ্মশান-সম পৃথিবীর কি চেহারা!
কেমন জীবন্ত আহা ঘুমঘোরে অচেতন,
ক্ষীরোদ সাগরে যেন ঘুমাইয়া নারায়ণ।
বড় ভালবাসি আমি তারকার মাধুরী
মধুর-মুরতি এরা, জানে নাকো চাতুরী।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

অনুশীলনী

১। অন্ধকার রাতে তারায়-ভরা আকাশ কখনো চাহিয়া দেখিয়াছ? তারায়-ভরা আকাশের দিকে চাহিয়া তোমার কি মনে হয়, বিস্তৃত করিয়া লিখ।

২। উপরের কবিতার মধ্যে কবির মনের ভাবনার কি কি পরিচয় পাও, সংক্ষেপে লিখ। কবির ভাবনা আর তোমার মনের ভাবনায় কোন মিল আছে কি?

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) চাঁদের ছেলের মত……রেখে গেছে এরে।

(খ) ক্ষীরোদ সাগরে……ঘুমাইয়া নারায়ণ।

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি !—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রয় আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মোছে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে স্নেহের কৌশলে ?
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে।

—মধুসূদন দত্ত

অনুশীলনী

১। অর্থ বুঝিয়া কবিতাটি পাঠ কর (না দেখিয়া আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই)।

২। 'সরস্বতী'র নিকট তোমার কোন প্রার্থনা আছে? সরস্বতীর প্রতি কবির কথাটুকু বুঝাইয়া বল। কবির কথা তোমার কেমন লাগে ?

৩। অর্থ বুঝাইয়া বল :—দড়ে, রড়ে, সান্ত্বনে, খেদ, স্নেহের কৌশল।

৪। (ক) ব্যাখ্যা কর :—তৃষাতুর জন যথা……দেবি সরস্বতি !

(খ) এই অংশে কাহার সহিত কাহার তুলনা করা হইয়াছে,—বুঝাইয়া বল।

বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—

ফুটি যেন স্মৃতি জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরসে কি বসন্ত, কি শরদে !

—মধুসূদন দত্ত

অনুশীলনী

১। কবিতাটি অর্থ বুঝিয়া আবৃত্তি কর।

২। বঙ্গভূমির প্রতি কবি কি প্রার্থনা জানাইয়াছেন ? বঙ্গভূমিকে "শ্যামা জন্মদে"ই বা বলিয়াছেন কেন ?—বুঝাইয়া বলিতে পার ?

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) প্রবাসে দৈবের বশে······তাহে।

(খ) চিরস্থির করে নীর······জীবন-নদে ?

(গ) ফুটি যেন······কি শরদে !

———

দেশের মাটি



মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি !

চন্দনেরি গন্ধে ভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখান্‌টিতেই শীতল-পাটি !

শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপোর কাঠি !

নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি।

মউল্ ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।

নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানি' জোগায় গো সে,
কোল ভরা তার কনক ধানে,
আটটি শীষে বাঁধা আটি।

সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবি এখানে কোন্ দেশের মাটির কথা বলিতেছেন? দেশের মাটি 'মধুর চেয়েও মধুর', 'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি'—কেন? 'দেশের মাটি' সম্বন্ধে কবির মত ঠিক বলিয়া মনে হয় কি?

৩। উপরের কবিতায় আমাদের দেশ সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া বল।

৪। অর্থ বুঝাইয়া দাও :—

(ক) নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না……রূপার কাঠি!

(খ) নাগের বাঘের……দিনে রাতে।

(গ) কোল ভরা তার……বাঁধা আটি।

(ঘ) সে যে গো নীল-পদ্ম……কান্নাকাটি।

———



তুমি

যখনই দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ তারি চারিপাশে !
কোথা হতে জ্বলে দীপ সম্মুখে তাহার ?
নয়নে দরশ আসে চলে সে আবার !
যখনি হৃদয় যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার
কোথা হতে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপূর !

—চিত্তরঞ্জন দাশ

অনুশীলনী

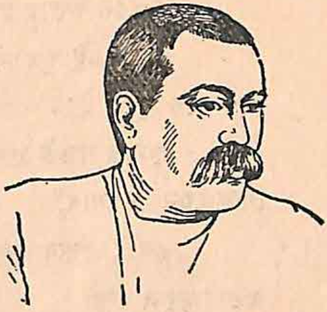
১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবিতাটির সারমর্ম বুঝাইয়া লিখ।

৩। ব্যাখ্যা কর :—

যখনি হৃদয় যন্ত্রে……প্রাণ ভরপূর !

লজ্জাবতী লতা



ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ করে এক ধারে আছে সরে,
ছুঁয়ো না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরুলতা যত আর চেয়ে দেখ চারিধার
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা!
আহা, ঐখানে থাক্, দিয়ো নাকো ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে
যেয়ো না উহার কাছে, খাও মোর মাথা!
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, উটি লজ্জাবতী লতা!
লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা নহে তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর!
যায় না কাহারো পাশে, মান মর্যাদার আশে,
থাকে কাঙালীর বেশে একা নিরন্তর—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর!

নিঃশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর !—
এ হেন লতার হায় কে জানে আদর ?
হায়, এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্তন ;
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন ?
স্বভাব মৃদুল ধীর প্রকৃতিটি সুগম্ভীর
বিরলে মধুর-ভাষী মানস-রঞ্জন ;
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন !
ছুঁয়ো না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানস-রঞ্জন !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। 'লজ্জাবতী লতা' কখনো দেখিয়াছ ? উহাকে ঐ নামে ডাকে কেন ?

৩। এখানে লজ্জাবতী লতার সঙ্গে কবি কাহাদের তুলনা করিয়াছেন, এবং কেন ?

৪। কবিতাটির মূল ভাব নিজের ভাষায় লিখ।

৫। ব্যাখ্যা কর :—সমাজের প্রান্তভাগে……যেমন !

সন্তানক

সেদিন সাঁঝে ছিল না কাজ হাতে
জানালা পথে বাহিরে ছিনু চেয়ে ;
প্রাঙ্গণেতে মালীর ছেলে সাথে
খেলিতেছিল আমারই ছোট মেয়ে।
দুইটি সাথী—বয়স প্রায় সমান
ঐ টুকুন-ই দুটির মাঝে মেলে ;
তফাৎ সবই, হয়না দিতে প্রমাণ—
আমার মেয়ে,—আর সে মালীর ছেলে !
হোক্‌গে যাক্‌, খেলা বই ত নয় ;
অন্য লোকে জান্‌বে বা কি করে ?
সন্ধ্যা হলেই ভাঙ্‌বে পরিচয়,
মালীর ছেলে ফির্‌বে তাদের ঘরে।
কিন্তু দেখি, এও ত লাগে বেশ—
দুটি যেন আপন ভায়ে-বোনে
খেলায় মেতে, নাইক ভেদ-লেশ—
সকল ভুলে' খেলে আপন মনে !
ভালবেসে এ ও'র ঘাড়ে চড়ে,
মধুর হেসে ও এরে টানে কোলে,
ইহার কেশে ঘাসের মালা পড়ে,
বক্ষদেশে উহার হার দোলে।

বড় মধুর শিশুর ছেলেখেলা—
বড় মধুর কাঁচা মুখের হাসি!
কেন ফুরায় এমন সুখের বেলা,—
কেন ফুরায় এমন ফুলের রাশি?

চাইতে চক্ষু আর্দ্র হয়ে আসে—
কে মিলালে অমিলের এই মিল!
ধনীর ছেলে গরীব ভালবাসে,
কে খুলিল অসম্ভবের খিল?

একি! আবার মারামারি, একি?
ও কি! আমার খুকীর গায়ে লাথি!
সে অপমান আমি চেয়ে দেখি—
খেলিস্ বলে' তুই কি তাহার সাথী?

বিষম রেগে ডাকিয়া দরোয়ানে,
হুকুম দিনু ধরিয়া আন ওরে;
নিমেষ মাঝে বাঁধিয়া তারে আনে,
দাঁড়াল আসি মুখটি নীচু করে।

চাবুক লয়ে মারিতে গেনু যেই,
খুকী,—সে আসি আছাড়ি' পড়ি' পায়ে
কহিল কাঁদি'—উহার দোষ নেই,
আমিই আগে মেরেছি ওর গায়ে।

ভুলিনু রোষ কন্যা পানে চেয়ে—
স্বর্গ যেন উঠিল ফুটি' চোখে !
অশ্রু এল নয়ন 'পরে ছেয়ে,
বাক্যহীন রহিল যত লোকে।
নিমেষে ভুলি মান ও অপমান,
দুজনে টানি নিলাম দুই কোলে
আমারি চোখে চাহিল ভগবান,
আমারি বুকে সন্তানক দোলে !

—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবিতার কাহিনী নিজের ভাষায় বল।

৩। ছোট দুই বন্ধুতে খেলিতে খেলিতে ঝগ্‌ড়া হইয়াছিল। কবি কেন তাহাদের একজনকে চাবুক দিয়া মারিতে গিয়াছিলেন, খুকীই বা কেন কাঁদিয়া বারণ করিল—বুঝাইয়া বলিতে পার ?

৪। ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) চাইতে চক্ষু……অসম্ভবের খিল ?

(খ) আমারি চোখে……সন্তানক দোলে

———



রাঙা চুড়ি

পিতা আসিলেন বাড়ী   রাঙা চুড়ি, রাঙা শাড়ী
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সেই চুড়ি পরি' হাতে   সে আজ আমোদে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
শানাই শুনিয়া কানে   পূজার মণ্ডপ পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায়,
ভাঙিয়া কাঁচের চুড়ি   একেবারে হল গুড়ি,
ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।
উঠিবে না ধূলা ঝাড়ি   ফিরিতে চাহে না বাড়ী,
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া ;
ভাঙা চুড়ি বার বার   জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া লুটিয়া !
পিতা আসি তুলে বুকে,   বলে, চুমা দিয়া মুখে,
"গেছে যাক্, ভারী এর দাম।"
থামে না'ক কোন মতে   তবু খুকী শুয়ে পথে
ফুঁপে ফুঁপে কাঁদে অবিরাম।

ব্যথা কি বুঝিবে তারা সব জিনিষের যারা
দাম কষে টাকায় আনায় ?
দরদের ধন হেন যত তুচ্ছ হোক কেন,
মিলিবে কি রূপায় সোনায় ?
সমগ্র বালিকাপ্রাণ চুড়ি সনে খান খান,
বল কেবা দিবে দাম তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে এ ভুবন আঁধার।

—কালিদাস রায়

অনুশীলনী

১। গল্পটি নিজের ভাষায় বল।

২। চুড়ি ভাঙিয়া গেলে খুকীর মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল ? কম দামের কয়গাছি চুড়ির জন্য খুকী অত কাঁদিয়াছিল কেন,—বলিতে পার ?

৩। অর্থ বুঝাইয়া বল :—

(ক) ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।

(খ) ব্যথা কি বুঝিবে······টাকায় আনায় ?

(গ) এমন পূজার দিনে······ভুবন আঁধার।

চল্ চল্ চল্



চল্ চল্ চল্ !
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্ ॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

বল্ রে নও-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল,
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্॥

—নজরুল ইস্‌লাম

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবিতাটির ভাব নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৩। ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) ঊষার দুয়ারে……বাধার বিন্ধ্যাচল।

(খ) বল্ রে নও-জোয়ান……জীবনের আহ্বান।

———

ঘুম পাড়ানি



আয়রে আমার সুধার কণা, আয়রে ননীর ছবি,
আয়রে নিশার সোনার চাঁদ, আয়রে উষার রবি ;
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস্ বনের পাখী,—
যাস্‌নে ওরে, আয়রে তোরে বুকে করে রাখি।
উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্‌রে চলে,
পাষাণ ভাঙা নির্ঝরিণী—ভাঙা ভাঙা বোলে ;—
ঘাড়ের কাছে সোনার বরণ—চুলগুলি তোর দোলে ;
যাস্‌রে কোথা—আয়রে যাদু, ঘুমা আমার কোলে।
তুই রে শিশু দুষ্ট বড় আসিস্ নাকো কাছে,
ভাবিস্ কিরে অশ্রুনীরে ভিজে যাস্‌রে পাছে ?
না যাদু তোর হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটবে মধুর চাঁদের আলো এ আঁধার পুরে।

তবে যদি তোর সুখে সুখী আমার অশ্রু ঝরে,—
আমার স্বভাব কেঁদে ফেলিরে হাস্‌তে হৃদয় ভরে—
চোখের নীচে হাসিস্‌ শিশু জড়িয়ে আমার গলে,
রচিস্‌ তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।
ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস্‌ মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধ্যেবেলা আসিস্‌ আমার বুকে ;
এম্‌নি করে পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোনা আমার, মাণিক আমার, যাদু আমার ঘুমো।

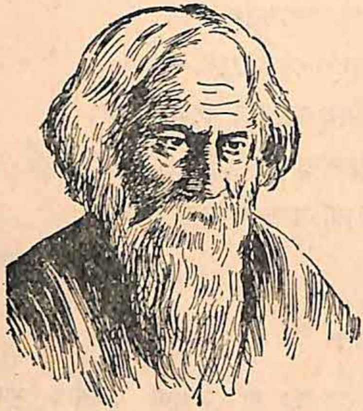
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

অনুশীলনী

১। ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়াছ? তোমার মা কখনো তোমায় ঘুম পাড়ানি গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে? তখন তোমার কেমন মনে হইত?

২। এই কবিতাটি মায়ের কণ্ঠে 'ঘুম পাড়ানি' গানরূপে শুনিলে ভাল লাগিবে?

৩। কবিতাটির ভাব নিজের ভাষায় লিখ।



লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি
ভোরের বেলা মাগো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হার—
তখন কি মা চিন্‌তে আমায় পার।
তুমি ডাক, "খোকা কোথায় ওরে।"
আমি শুধু হাসি চুপ্‌টি করে॥

যখন তুমি থাক্‌বে যে-কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখব নয়ন মেলে।
স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে
আস্‌বে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে ;
এখান দিয়ে পূজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে ;
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে,
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে ॥

দুপুর বেলা মহাভারত হাতে
বস্‌বে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়্‌বে এসে তোমার পিঠে কোলে ;
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি ;
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে,
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে ॥

সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ্‌ করে মা পড়্‌ব ভুঁয়ে ঝরে।

আবার আমি তোমার খোকা হব,
"গল্প বল," তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বল্‌বে, "দুষ্টু, ছিলি কোথা।"
আমি বল্‌ব, "বল্‌ব না সে কথা।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। মার সঙ্গে দুষ্টুমি করিয়া মাকে ভাবাইয়া তুলিতে তোমার ইচ্ছা করে না? দুষ্টুমি করিয়া মাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিলে,—এমন একটি মজার গল্প বল।

২। এই কবিতায় কবি মা'র সঙ্গে দুষ্টুমি ভরা লুকোচুরি করিবার যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া বল। কবির কল্পনাটি তোমার কেমন লাগে?

৩। কবিতাটি আবৃত্তি কর।